৩য়। অন্যান্য মশকেরা যেখানে একটু অপরিষ্কার জল পায়, সেখানেই ডিম ত্যাগ করে। কিন্তু যে সকল ডোবার চারি পাশে নল খাগড়া বা অন্য প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ জন্মায়, এনোফিলিস্ সেই খানে ডিম পাড়ে।

৪র্থ। মশকদিগের এই সকল পোকা মৎস্যদিগের আহার। মাছের 'পোনা' সকল, বিশেষতঃ রূপচেণা, তেচোকো প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যেরা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই খাইয়া ফেলে। কিন্তু নলখাগড়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাইতে পারে না।

৫ম। এই বাঘিনীরা জন্মস্থান হইতে ৪০০ হাতের অধিক দূর সাধারণতঃ যাইতে পারে না। এবং যেখানে মনুষ্যের রক্ত খাইতে পায় তাহারই নিকটে কোন অন্ধকার স্থানে দিনে লুকাইয়া থাকে। দিবসে বাহির হয় না।—জাত বাঘিনী কি না!

৬ষ্ঠ। যদি স্ত্রীমশকেরা মনুষ্যরক্ত পান করিতে না পায় তাহা হইলে ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই লোকালয়ে মশকবংশের এত প্রাদুর্ভাব ও অন্যত্র ইহারা এত সুদুর্লভ।

৭ম। তরুণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদিগের কুইনাইন সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং কিছু দিন সেবনের ফলে জীবাণু সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়।

৮ম। যে সকল সুস্থ ব্যক্তি সপ্তাহে দুই দিন ৮।১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন সেবন করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত এনোফিলিস্ ম্যালেরিয়া জীবাণু সংক্রামিত করিলেও উক্ত জীবাণু পরিপোষক উপাদান অভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে না. সুতরাং সুস্থ ব্যক্তি জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন না।

৪র্থ অধ্যায়—উক্ত উপায় সকল অন্যত্র অবলম্বনের ফলাফল।

এই সকল তথ্য সংগ্রহের পর বৈজ্ঞানিকেরা উহা প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃটিশশাসিত রাজ্য সমূহে রোনাল্ড রস স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। জর্ম্মণ পণ্ডিত কক্ সাহেব জর্ম্মানশাসিত রাজ্যসমূহে ও দেশবিখ্যাত চেলী সাহেব ইটালীতে কার্য্যারম্ভ করিলেন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পন্থা অনুসৃত হইয়াছিল :—

১ম। ম্যালেরিয়াদুষ্ট প্রদেশ সমূহ হইতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা। পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালীসমূহ আবিল জল সম্পূর্ণরূপে ও দ্রুতভাবে দূরে প্রেরণ করা।

এ কার্য্য বিস্তর অর্থসাপেক্ষ। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রজাশক্তির ক্ষমতার বাহিরে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে রাজা এবিষয়ে সাহায্য করিতেছেন সে সংবাদ হয়ত অনেকে রাখেন না।

২য়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের উচ্ছেদ। এই সকল অব্যবহৃত ডোবা মশক উৎপাদনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এই প্রকার জলাশয় মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে অসংখ্য আছে। সবগুলি বুঁজাইয়া ফেলা অসম্ভব, সুতরাং তদভাবে—

৩য়। দুর্গন্ধ অব্যবহৃত জলাশয়গুলিতে মাঝে মাঝে কেরোসিন তৈলের একটা আবরণ দেওয়া; তাহাতে মশক পোকা মরিয়া যায়। ব্যবহৃত পুষ্করিণীতে প্রচুর মৎস্য ছাড়িয়া দেওয়া ও চারি পাশের সমস্ত জঙ্গলের উচ্ছেদ করা। এবং

৪র্থ। বাসগৃহের নিকট ৪০০ হস্তের মধ্যে এনোফিলিস্ উৎপন্ন হইবার উপযোগী কোন প্রকার বৃহৎ বা ক্ষুদ্র জলাশয় না রাখা। এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। গোক্ষুরখাত ক্ষুদ্র গর্ত্তে শত শত মশক কীট দেখা যায়। সাহেবদিগের নিত্য সযত্নসিক্ত ফুলগাছের টব উক্ত মশকদিগের বিস্তীর্ণ জন্ম ও লীলাক্ষেত্র।

৫ম। সন্ধ্যার পর সম্পূর্ণরূপে দেহ আবৃত রাখিয়া বাহির হওয়া ও মশারী দ্বারা দেহ রক্ষা করিয়া শয়ন করা।

ষষ্ঠ। আবাস ঘরে দরজা জানলা এ রকম ভাবে প্রস্তুত করা যাহাতে মশক প্রবেশ লাভ না করিতে পারে। বাঙ্গালী শুনিয়া অবাক্ হইবেন অনেক স্থানে এ পরীক্ষা সত্য সত্য করা হইয়াছে এবং সাহেবেরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

৭ম। যখন ম্যালেরিয়ার এপিডেমিক আরম্ভ হয়, তখন সকলেরই সপ্তাহে দুইদিন উপরি উপরি দশগ্রেণ করিয়া কুইনাইন সেবন করা।

এই প্রকার পন্থা পৃথিবীর বহু স্থানে অনুসৃত হইয়াছিল। তাহার ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১। ইস্মালিয়া—সুয়েজখাল উৎখাত হইলে তাহার তীরে অনেকগুলি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইস্মালিয়া তাহাদিগের অন্যতম। এই সহরে প্রথমে কোন প্রকার ম্যালেরিয়া ছিল না। পানীয় জলের অত্যন্ত অসদ্ভাব হওয়াতে নিকটবর্ত্তী নদী হইতে খাল কাটিয়া মিঠা জলের আমদানী করা হইল। জলের দুঃখ দূর হইল বটে, কিন্তু ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইল। ফল ১৫ তালিকার (ক) দ্রষ্টব্য। ম্যালেরিয়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া রস্ সাহেব ১৯০২ সালে তথায় পূর্ব্ববর্ণিত ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। কত শীঘ্র কত সুফল ফলিয়াছে পরবর্ত্তী কয় সনের জ্বর-সংখ্যার হ্রাসই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

২। সুইটেনহাম—মালয় উপদ্বীপে সুইটেনহাম বন্দরে রোগসংখ্যা ১৫ তালিকার (খ) অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। সহরে ১৯০১ সাল হইতে উক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালিত হওয়াতে রোগীর সংখ্যার উত্তরোত্তর হ্রাস ও মফঃস্বলে কোন প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন না করাতে রোগীর সংখ্যার বৃদ্ধি তালিকায় পরিস্ফুট হইতেছে।

৩। পানামা—পানামা-যোজকের গত ২০ বৎসরের ইতিহাস এই উপপত্তির সত্যতা সমর্থন করিবে। অধিকাংশ পাঠকই জানেন যে, সুয়েজ যোজকে কৃত্রিম খাল খননকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লেসেপ্ সাহেব জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পানামা যোজক কাটিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ দিয়া জাহাজ যাতায়াতের একটী খাল খনন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই কার্য্য নানা কারণে তিনি অসম্পূর্ণ

রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর। এই দুই রোগে শত শত কুলী মারা যাইতে লাগিল। তখনকার বিজ্ঞানসম্মত সকল প্রকার চিকিৎসা ইহা প্রতিরোধ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই।

এখন কিন্তু রস সাহেবধৃত ম্যালেরিয়ার জ্বরের উপপত্তির সঙ্গে সঙ্গে পীতজ্বরের উপপত্তিও স্থিরীকৃত হইয়াছে। উক্ত রোগটীও Stegomaya Fasciata নামক অন্য এক প্রকার মশক হইতে উদ্ভূত। সুতরাং মশকবংশ উচ্ছেদকার্য্য দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করিয়া বর্ত্তমান কার্য্যের সম্পাদক গার্গাস সাহেব এই রোগের হস্ত হইতে কুলীদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"অয়নান্তবৃত্ত মধ্যে যে দুই ভয়াবহ লোকক্ষয়কর রোগে এত দিন লোক ধ্বংস হইত, এখন নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইল যে উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিতে পারা যায়। এই প্রণালী যুগপৎ সহজ ও অল্প অর্থব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং পৃথিবীর আদিমকালে যেমন উষ্ণপ্রদেশ সভ্যতার আদর্শ স্থল ছিল, পুনরায় ভবিষ্যতে উহা আবার মনুষ্যসমাজের ধনজন ও সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির কেন্দ্র হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

৪। ইটালী—ইটালীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সাদৃশ্য অনেক বিষয়ে। উভয় দেশেই বিস্তীর্ণ সমতল শস্যক্ষেত্র, বৃহৎ জলাভূমি এবং উভয় ভূখণ্ডই অর্দ্ধভুক্ত অনশনক্লিষ্ট কৃষকসমাকুল। এই ইটালী প্রাচীন-কাল হইতেই ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি। এই রোগও তদ্দেশবাসীর জাতীয় উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। এমন কি, এক জন বিখ্যাত লেখক এক মাত্র ম্যালেরিয়া রোগকেই গ্রীস ও রোমদেশের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ম্যালেরিয়ায় জীবনী-শক্তি কি পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়, সন্তানসন্ততি কি প্রকার দুর্ব্বল হইয়া জীবনসংগ্রামে অক্ষম হয়, তাহার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে; তজ্জন্য বাঙ্গালীর নিকট ইটালীর দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

এতকাল বাদে চেলী সাহেবের প্রভূত চেষ্টায় ও তথাকার Anti-malarial Leagueএর সাহায্যে ইটালীবাসীরা এই বিপদ্ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে। সমগ্র রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই রোগ নির্ম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্রফেসর চেলী অনেক চেষ্টার পর আইন করাইয়া লইয়াছেন যে, কুইনাইন তথায় বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক স্থানে বলিয়াছেন Malaria একটী "uufall" অর্থাৎ দুর্ঘটনা মাত্র। উক্ত রোগে মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে যদি কেহ মারা যায়, তবে তাঁহার আত্মীয় চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারেন, কেন না মিউনসিপ্যালিটীর সতর্কতার অভাবই তাহার প্রমাণ"। কথাগুলি আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ও দেশের তুলনায় প্রলাপ বলিয়া মনে হয় না কি?

এতক্ষণে দেখা গেল যে, রস সাহেবধৃত উপপত্তির প্রয়োগে পৃথিবীর বহু স্থানে সুফল পাওয়া গিয়াছে, রোগসংখ্যা বহুস্থানেই প্রভূত পরিমাণে হ্রাসিত হইয়াছে এবং অনেক

স্থানে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন এই ম্যালেরিয়া রোগের আকরভূমি বাঙ্গালা দেশে গবর্ণমেণ্ট কোন পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? নিম্নে তাহার ফলাফল দেওয়া গেল।

২। কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে যাহাতে উহা লভ্য হয়, তজ্জন্য ডাকঘরে উহা বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছে।

২। মিয়ানমিরে বৎসর কয়েক ধরিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

৩। এই রোগের প্রসার ও কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ড্রেনেজ কমিটী নামক একটী সমিতি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডিন্সী ডিবিজনে দুই জন বিচক্ষণ সাহেব ডাক্তার নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বিভিন্ন জেলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক) কতকগুলি বদ্ধ নদী উন্মুক্ত করিতে হইবে। যথা—মাথাভাঙ্গা, কুমার, ভৈরব, নবগঙ্গা ইত্যাদি।

(খ) কতকগুলি খাল খনন করিয়া দেশের জল সহজে নিকাশ করিতে হইবে। শুনিলাম, এই উপদেশ অনুযায়ী মগরাহাট ও বাগ্‌জোলার খাল খননকার্য্য শেষ হইয়া আসিতেছে।

(গ) পূর্ব্ববর্ণিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি নিম্নপ্রাথমিক ও মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। শুনিলাম, এ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে।

(ঘ) মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ, মণিরামপুর ইত্যাদি কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটীতে স্যানি-টারী কমিশনারের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা চলিতেছে। এক জন সিবিল-সার্জ্জন, দুইজন এসি-ষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও জন কয়েক সহকারী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা কি করিতেছি? যাহাদিগের ঘরে ঘরে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ, তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। সম্মুখে প্রভূত কার্য্য স্তূপীকৃত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ করিয়া লোক সমাজকে শিক্ষিত করিতে হইবে। ম্যাজিক-লণ্ঠন ও অন্য উপায়ে এনোফিলিস মশক নির্ব্বাচন শিক্ষা দিতে হইবে। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করিয়া কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে সহজে ও সুলভে ফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত বা পয়ঃপ্রণালী সামান্য চেষ্টাতেই পরিষ্কার হইতে পারে। গ্রাম-বাসীদিগকে এই বিষয়ে প্রণোদিত করিতে হইবে। শিক্ষিতসমাজের এই গুলি কঠোর কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়ার গ্রাম ধ্বংস হওয়াতে আমাদের দেশের শিল্পসকল লোপ পাইয়াছে। এ যুক্তি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ম্যালেরিয়া ও বিদেশী বাণিজ্য এই দুইটী কারণের সমবায়ে গ্রামসকল ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়াছে; হয়ত বিদেশী বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারক হইয়া গ্রামবাসীরা নিঃস্ব হইয়া পড়িল। অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাপন্ন লোক গ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে চাকুরীর সন্ধানে গেল, কেহবা জাতি-ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিল। যাহারা দুই বিষয়েই অপারক, তাহারা স্বীয় গ্রামে অস্বাস্থ্যকর

ভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। গ্রামে লোকের সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে ও অধম ব্যক্তির প্রাধান্য হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত রাস্তা, পথ এবং প্রণালী পরিষ্কার হইল না। বিদেশে যাহারা বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বসতবাড়ী জঙ্গলে আবৃত হইয়া গ্রামবাসীদিগের অস্বাস্থ্যের কারণ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা আর পূর্ব্বের মত শিল্পের উন্নতি করিতে পারিল না। এই রকম করিয়া শিল্পের লোপ হইয়াছিল। উক্ত বর্ণনাটি কাল্পনিক নয়। পরিপোষক মতস্বরূপ, নদীয়াজেলার তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় উক্ত জেলার অবনতির কারণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সার বাঙ্গালায় সংকলিত হইল :—

'বিদেশী বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বত্রই দেশীয় শিল্পের লোপ হইতেছে,—শান্তিপুর ও কুমারখালির সূতীকাপড়ের আর তেমন সমৃদ্ধি নাই, হরিণঘাটার ছুরী কাচী ইত্যাদির ব্যবসায় প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যেখানেই যাও দেখিবে, প্রায় অধিকাংশ সমৃদ্ধিশালী গ্রামেই অবনতির করাল ছায়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ; গৃহসকল অধিকাংশই ভগ্নস্তূপ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জমিদার ও সদাশয় মহাত্মাদিগের দত্ত পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার মাত্র হয় না। পুষ্করিণীসকল বহুবৎসরজাত জলজউদ্ভিদে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ অধিবাসী গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। গ্রামে বসিয়া আর পারিশ্রমিক পাইবার ভরসা নাই, স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর; সুতরাং অধিকাংশ লোক কলিকাতা ও পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে। সমগ্র জেলাটীতে গঙ্গার শাখা প্রশাখা দিয়া বাণিজ্যপণ্য নৌকাপথে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল। এই সকল নদীর উভয় পার্শ্বস্থ অনেক সমৃদ্ধ বন্দরে নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্যের আগম নির্গম হইত; উত্তর বাঙ্গালা ও সুদূর উত্তরপশ্চিম হইতে দেশী নৌকায় দ্রব্যসম্ভারে নদীর উভয়কূলের অসংখ্য গ্রাম লক্ষ্মীশ্রীতে সমুজ্জ্বল ছিল। কিন্তু এখন 'তেহি নো দিবসাগতা'—সে দিন আর নাই। নদীর প্রাচীন খাতসকল ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মহাজনী নৌকার চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই বাণিজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ রেলগাড়ীর সৃষ্টি।"

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় আবার একপদ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, রেলগাড়ীর চলাচলের জন্য যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে উহাই ম্যালেরিয়ার মূলকারণ। এই রেলরাস্তা বাণিজ্য-সুগম সহরের নিকট দিয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রায়ই দেশের জলনিকাশের বিপরীত দিক্ দিয়া লওয়া হইয়াছে। বাঁধের দুইধারে যে সকল কৃত্রিম খাত করা হয়, তাহাতে পর্য্যুষিত জল যে ম্যালেরিয়া বিস্তারের সহায়তা করে না এ কথা বলাকঠিন। ইটালীর পণ্ডিত গালা (ভেলিরিও) Galla Valerio উপদেশ দেন যে, রেললাইন করিবার সময় উভয়-পার্শ্বে খাত করিতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—'ইটালী ও ভারতবর্ষে রেলের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হইয়াছে এবং উভয়দেশেই লাইনের নিকট-বর্ত্তী স্থানসকল সর্ব্বদাই অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে গত তিনবৎসর উপর্য্যুপরি

ম্যালেরিয়ার বিষম প্রকোপ হইয়াছে। পূর্ব্বে এ প্রকার দুরবস্থা ছিল না। প্রায় তিন চারি বৎসর হইল মুর্শিদাবাদ রেল-লাইন সহরের নিকট দিয়া গিয়াছে। তত্রত্য সিভিল-সার্জ্জন সাহেব এই রেললাইন এর উপর জ্বর-সংখ্যাবৃদ্ধির আরোপ করিয়াছেন।'

আমাদের গ্রাম ও জনপদগুলিকে উদ্ধার করিতে হইলে এক সঙ্গে দুই বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। প্রথম আত্মরক্ষা, দ্বিতীয় শিল্পোন্নতি। আজ কাল শিল্প উন্নতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—সমস্ত শক্তি সেই দিকে চালিত হইয়াছে। শত শত মহাপুরুষ নানাপ্রকার কলকারখানা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া গ্রামগুলিকে সজীব করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কেবল শিল্পোন্নতি হইতে কিছু ফল হইবে না। তৎসঙ্গে এমন কি, তৎপূর্ব্বে গ্রামসকলের স্বাস্থ্য উন্নত করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-রূপী মহাসুরকে বিতাড়িত করিতে হইবে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের সেই কয়েক পংক্তি আবার উদ্ধৃত করিতেছি, কারণ, উহা বড়ই মূল্যবান্—

"স্বজাতির উন্নতি-প্রত্যাশার পূর্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় এক-বার লক্ষ্য করা আবশ্যক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মূলীভূত।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর প্রাণপণে।
কিন্তু গৃহমূলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে॥"

প্রথম তালিকা।

লোকসংখ্যার উন্নতি অবনতি শতকরা হিসাবে :—

(উন্নতি,—অবনতি)

	১ম গণনা	২য় গণনা	৩য় গণনা	মন্তব্য
স্থান—	১৮৭২-৮১	১৮৮১-৯১	১৮৯১-১৯০১	
ভারতবর্ষে	২৩'১	১৩'১	২'৪	
বঙ্গ (পুরাতন)	১১'৫	৭'৩	৫'১	
পশ্চিমবঙ্গ	—২'৭	৬'৯	৭'১	
মধ্যবঙ্গ	১১'৭	৩'১	৫'১	
পূর্ব্ববঙ্গ	১০'৯	১৪'১	১০.৪	

দ্বিতীয় তালিকা।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনে লোকসংখ্যার

উন্নতি,—অবনতি।

জেলা	১৮৭২-৮১	৮১-৯১	১৮৯১-১৯০১
চব্বিশপরগণা	৬·২	৩·১	৯·৮
যশোর	৩৩·৬	২·৬	—৪·২
খুলনা	৩·১	৯·৯	৬ ৪
নদীয়া	১০·৮	—১·১	১ ৪
মুর্শিদাবাদ	১·০৪	১·৯	৬·৫

তৃতীয় তালিকা।

চব্বিশপরগণার উপবিভাগসমূহে লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, শতকরা হিসাবে।

ক। মিলবহুল স্থান—

উপবিভাগ	১৮৮২-৯১	১৮৯১-১৯০১
খড়দহ	+১৫·৯	+৭ ৯
নৈহাটী	+১১ ৮	+১১·৮
বজ্‌বজ্‌	+১৪·৩	+১২ ৭
বরাহনগর	+ ১৪ ৩	+১২·৭
সদর	১১ ৮	+৯·৯

খ। মিলবিহীন স্থান—

উপবিভাগ	১৮৮২-৯১	১৮৯১-১৯০১
নবাবগঞ্জ	+৬৯·২	+৭ ৯
বারাসত	+৩ ৪	+১·৩
দেগঙ্গা	—৫·৪	—৯·৯
ডাবড়া	—৫ ৪	—০ ৯
দমদম	+১৮·৮	+১·৪

চতুর্থ তালিকা।

বিভিন্ন বৎসরে হাজার প্রতি মৃত্যুসংখ্যা—

দেশ	১৮৯১	১৮৯৩	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	১৯·৮	১৭	১৫·৪	১৫·৩	১৫·২	১৪·১
বঙ্গদেশ	২৬·৯	৩১·৩২	৩৩·৩	৩২·৫	৩৮·৬	৩৬
বোম্বাই	২৭·২	৩১·২	...	৪১·৪	৩১·৮	...
মান্দ্রাজ	২৬·২	২২·৩	...	২২·৫	২১ ৪	...

পঞ্চম তালিকা।

গত বিংশ বৎসরে বঙ্গে মৃত্যুসংখ্যা হাজার প্রতি—

১৮৮৫—২৩

১৮৯৫—৩১

১৯৭৪—৩২

১৯০৫—৩৯

ষষ্ঠ তালিকা।

বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জ্বররোগে হাজারপ্রতি মৃত্যুসংখ্যা, ১৯০০ হইতে ১৯০৪ সালের হারাহারী—

প্রেসিডেন্সী	২৪৮
বর্দ্ধমান	২০.৫
পাটনা	২১.৫
ভাগলপুর	২৩৯
উড়িষ্যা	১২.৯
ছোটনাগপুর	১৬.৭
সমগ্র জেলা	২১৭

সপ্তম তালিকা।

লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি শতকরা হিসাবে।

স্থান	১৮৯১-১৯০১	মন্তব্য
ভারতবর্ষ	+২.৪	
বঙ্গদেশ	+৫.১	
যুক্তসাম্রাজ্য	+৯.৯	
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	+১১	
স্কটলণ্ড	+৯	
আয়র্লণ্ড	−৮	
নিউজিলণ্ড	+২১.৮	
অষ্ট্রেলিয়া	+২৮৬	
হংকং	+৯	
সিংহল	+১৮.৬	
যুক্তরাজ্য আমেরিকা	+২১০	
নেটাল	+৫৪.২	

অষ্টম তালিকা।

বিভিন্ন দেশের জন্মহার হাজার লোকপ্রতি—

দেশ	১৮৮১	১৮৯০	১৯০১	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
বঙ্গদেশ	৪৭.৯	৫১.৮	৪৩.৯	৪২.৩	৩৯.৫	৩৭.২২
ইংলণ্ড ও ওয়েলস	৩৪.৭	৩০.২	—	—	২৭.২	২৭
বেলজিয়ম	৩১.৫	২৮.৭	—	—	—	—
জর্ম্মণরাজ্য	৩৮.৯	৩৫.৭	—	—	—	—

নবম তালিকা।

১৯০৬ সালে হাজার প্রতি শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা—

সহর	সংখ্যা	হারাহারী
ম্যানচেষ্টার	১৫৭	১৪৬.১
বর্ম্মিংহাম	১৫৪	
লিভারপুল	১৫৩	
এডিনবর্গ	১৩৩	
গ্লাসগো	১৩১	
কলিকাতা		৩০৪

দশম তালিকা।

লণ্ডন ও কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যার তুলনা শতকরা হিসাবে—

সহর	১৮৬০	১৮৭০	১৮৮০	১৮৯০	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
লণ্ডন	২৪.৪	২২.৫	২০.৫	১৯.৬	১৬.৬	১৫.৬	১৫.৭
কলিকাতা	*	*	*	৩১.৬১	৩২.২	৩৮	৩৫.৭

একাদশ তালিকা।

১৯০৬ সালে প্রতীকারযোগ্য ও অন্যান্য রোগে বিলাত ও বঙ্গদেশে মৃত্যুসংখ্যার তুলনা হাজার জন লোকের প্রতি—

	ইংলণ্ড ও ওয়েলস	বাঙ্গালা
১। প্রতিকারযোগ্য রোগ যথা—হাম বসন্ত, টাইফয়েড জ্বর, বাত, নিউমোনিয়া ইত্যাদি	৫.৪২	৫.১৫
১ক। যথা—ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, কলেরা ইত্যাদি	... ...	২৩.৯৭

২। দুর্ঘটনা	...	...	০.৪৪	...	... ০.৫৩
৩। অন্যান্য কারণ		...	৬.১৮	...	... ৬.৪৭
			১৪.১৪		৩৬.১১

দ্বাদশ তালিকা।

বিভিন্ন রোগে মৃত্যুসংখ্যা হাজার জন প্রতি, ১৯০৬ সালে—

	জ্বর	বিসূচিকা	বসন্ত	সমগ্র মৃত্যুসংখ্যা
কলিকাতা	৪.৫৮	২.৯৫	.৩.৪২	৩৫.৭৩
বাঙ্গলার সহর সকল	১৪.৩৭	৩.০৩	০.৬৪	৩৭.৭৮
প্রেসিডেন্সী ডিবিজন	২২.৯৮	৩.৫৮	০.৫৪	৩৪.৬৬

ত্রয়োদশ তালিকা।

যশোরে দশ বৎসরে অর্দ্ধ হ্রাস—

থানার নাম	লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি		সমগ্র জন্ম	সমগ্র মৃত্যু	হ্রাসবৃদ্ধি জন্মমৃত্যু
	১৮৯১-১৯০১	১৮৮১-১৮৯১	১৯০১-১৯০৬	১৯০১-১৯০৬	
ঝড়কালিয়া	৪.৯	১১.৭	১৫,৮৯৭	১৪,৪১৩	১,৪৮৪
কোট চাঁদপুর	—২.৫	—৬.১	৫,৪৪৯	৬,৪৫৬	—১,০০৭
লোহাগড়া	—২.৫	১১.২	২১,২৫৮	২০,৭৭১	৬৮৭
গদখালি	—৪.৬	—৫.৫	১০,৪৮৪	১০,৬৩২	—১৪৮
সর্ষা	—২.৯	—১১.১	১২,৪০৭	১২,৫১৭	—১১০
যশোর	—৭.৫	--৫.৬	২১,১২৩	২৪,৬৮৯	—৩,৫৬৬
মণিরামপুর	—৪.৯	—৩.৮	২১,৪৫২	২৫,১৯১	—৩,৭৩৯
কেশবপুর	—৭.৫	—৩.০	১২,৬৮৯	১৩,৪৪১	—৭৫২
মহেশপুর	—৩.৬	—৮.২	১৬,০৩৫	১৯,১৫৬	—৩,১২১
বনগাঁ	—৪.৬	—৭.৪	১১,৩২৯	২১,৬৬৯	—৩,৩৪০
নড়াইল	১.৭	০.১	২৬,৪৭০	৩২,০১২	—৫,৫৪২
শোলকোপা	—০.৪	০.৪	২৯,৭৭৬	৩৫,৬০২	—৫,৮২৬
কালীগঞ্জ	—২.১	—৬.০	১১,৮৮৮	১৬,১৭২	—৪,২৮৪
মহম্মদপুর	—৮.৫	৮.৩	১৪,৯৯৯	৯৭,৫৮৪	—২,৫৮৫
মাগুরা	—৯.৭	৪.৩	২৩,১০৬	৩২,৩৪২	—৯২৩৬
বাঘেরপাড়া	—৫.৯	—৯.৮	৯,২৭৫	১১,৯০৯	—২৬৩৪
পাইখাচা	—৪.৪	—৯.৭	৭,৯৯৪	৩০,০৪৭	—২,০৫৩
শালিখা	—৪.৩	—৮.০	৭,৩২১	১০,৬৬৫	—৩৩৪৪
ঝিনাইদহ	—৫.৮	—১২.৩	১৩,০৭৫	১৭,৯০৭	—৪৮৩২
সমগ্র জেলা	—৪.০	—২.৬	২,৯৯,০২৭	৩,৫২,৯৭৫	—৫৩,৯৪৮

চতুর্দ্দশ তালিকা।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে জ্বররোগে মৃত্যুসংখ্যা, ১৯০১—১৯০৫ পর্য্যন্ত—

জেলা	সংখ্যা
যশোর	৩২·৪
নদীয়া	৩৩·৩
মুর্শিদাবাদ	২৯·৭
খুলনা	২০·৮
চব্বিশপরগণা	১৮·৩
সমগ্র মৃত্যুসংখ্যা প্রেসিডেন্সী ডিবিজনে	৩৪.৬

পঞ্চদশ তালিকা।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টার ফলাফল।

ক। ইস্‌ম্যালিয়ার মৃত্যুসংখ্যা :—

১৮৭৭ সালে	৩০০	১৯০০ সালে	২২৮৪
১৮৮২ „	৪৮০	১৯০১ „	১৯৯০
১৮৮৭ „	১৮০০	১৯০২* „	১৫৫১
১৮৯২ „	২০৫০	১৯০৩ „	২১৪
১৮৯৭ „	২০৮৯	১৯০৪	৯০
১৮৯৯ „	১৭৮৪	১৯০৫ „	৩৭

* ১৯০২ সালে জ্বরের বিরুদ্ধে নূতন মতে কার্য্য আরম্ভ হয়।

খ। সুইডেনহ্যামবন্দর—জ্বরসংখ্যা :—

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
সহর	৬১০০*	১১৯	৬১	৩২	২৩
জেলা	১৯৭	২০৪	১৫০	২৬৬	৩৬৩

* সহরে ১৯০১ অব্দের বিরুদ্ধে কার্য্য আরব্ধ হয়, মফঃস্বলে কোন কার্য্য করা হয় নাই।

গ। হাভানায় ম্যালেরিয়া-জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা :—

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৮৮০	৩২৫	১৯০১০	১৫১
		১৯০২	১৭৭
১৮৮৮	১০১	১৯০৩	৫১
১৮৯০	১৭০	১৯০৪	৪৪
১৮৯৫	২০৬	১৯০৫	৩২
১৯০০	৩৪৪	১৯০৬	২৬

১৯০১ সাল হইতে নূতন মতে জ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য আরব্ধ হয়।

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল বি, ই,

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি

———

সূর্য্যপদে উপানৎ

যাঁহারাই এতদ্দেশীয় দেবদেবীর প্রতিমাসম্বন্ধে কিছু না কিছু সংবাদ রাখেন, তাঁহারাই জানেন ভগবান্ সূর্য্যদেবের পদদ্বয় আজানুসমুত্থিত উপানদ্‌যুগলের মত কোন এক প্রাবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। অদ্যাবধি যত সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে সমুদয়েরই পদদ্বয় তদ্রূপ। দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যদেব আজকালকার বুট্‌জুতা পরিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার এবম্প্রকার পোষাক দেখিয়া মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন আসিয়া উদিত হয় যে, তাঁহার এ জুতা আসিল কোথা হইতে?

সাধারণতঃ আমাদের দেশে আমরা যে সব দেবদেবীর প্রতিমা গড়াইয়া থাকি, তাহা তাঁহাদিগের ধ্যান বা অন্য কোনরূপ রূপবর্ণনা অবলম্বন করিয়া। সূর্য্য আমাদের অনেকদিন হইতে একজন বড় দেবতা সুতরাং অনেক গ্রন্থেই তাঁর অনেকরূপ ধ্যান বা রূপবর্ণনা দেখিতে পাই। তিনি বৈদিক দেবতা হইলেও বেদ ব্যতীত আমি তাঁহার রূপসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি পুরাণে ও তন্ত্রে। অবশ্য সমস্ত পুরাণ ও তন্ত্র অনুসন্ধান করা হয় নাই, করিয়া উঠিতে পারিব কি না, জানি না। যতদূর করিয়াছি প্রবন্ধের শেষে তাহা উদ্ধৃত থাকিবে। পাঠকগণ দেখিবেন সে সব ধ্যানে কোথায়ও জুতার কথার উল্লেখ নাই।

তবে এ জুতা আসিল কোথা হইতে? বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সূর্য্যের প্রতিমা-করণ প্রস্তাবে "কুর্য্যাদুদীচ্যবেষং গূঢ়ং পাদাদুরোযাবৎ॥" (৫৮ অ° ৪৬ শ্লো°) বলিয়া উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকেই সূর্য্যের জুতা পরিধানের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পা হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত যে বেশে আচ্ছাদিত থাকে সেই উত্তর দেশীয় বেশকে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা জুতা পায় পাজামা পরা বেশ বলিয়াই মনে করেন। সূর্য্যের প্রতিমা সকলে কিন্তু পাদদ্বয় গূঢ় ব্যতীত পা হইতে বুক পর্য্যন্ত ঢাকা এমন বেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় সূর্য্যের পায়ে যাহা, তাহা কি জুতা?

অনুসন্ধান করিতে করিতে মৎস্যপুরাণে সূর্য্যঘটিত একটী গল্প দেখিলাম। গল্পে বলে, সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা যিনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সূর্য্যের তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নামে একটী স্ত্রীমূর্ত্তিকে আপনার স্থানে বসাইয়া দিয়া গোপনে পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। পিতা বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞার এই কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি তথা হইতে মরুদেশে যাইয়া ঘোটকীর আকার ধারণকরত অবস্থান করিতে থাকেন। সূর্য্য প্রথমে এসব কিছুই জানিতে পারেন নাই, ছায়াকেই সংজ্ঞা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ক্রমে যখন জানিতে পারিলেন যে সংজ্ঞা নাই, তখন একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া আমার সংজ্ঞা কোথায় বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী হাজির। বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, ভগবন্!

সংজ্ঞা আপনার তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া আমায় বাড়ী পলাইয়া আসে ও আমার তিরস্কারে আমার গৃহও ত্যাগ করিয়া উপস্থিত মরুদেশে ঘোটকীরূপে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমার নিবেদন আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তবে আমি আপনাকে আমার শানযন্ত্রে ফেলিয়া কিছু তেজ কাটিয়া কমাইয়া দি ও আপনাকে কতক সুদর্শন করিয়া দি। সূর্য্য এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিল। সূর্য্যের পদদ্বয় ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গের তেজ কমাইয়া দিল, পা দুখানি কিন্তু যেমন অসহ্য দর্শন ছিল তেমনিই রহিল।

পুরাণকার ইহাতে সমাধান করিলেন যে সেইজন্যই সূর্য্যমূর্ত্তির পূজাকালে সূর্য্যের পা কেহ দর্শন করেন না এবং এমন কি, সূর্য্যের পাদদ্বয় দেখিলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হইবে, এই ভয় দেখাইয়া একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, চিত্রতেই বল আর প্রতিমাতেই বল, ধর্ম্মার্থকামী কোন ব্যক্তি যেন কোনস্থানেই সূর্য্যের পদদ্বয় নির্ম্মাণ না করেন।

মৎস্যপুরাণের এই গল্পেই কি বরাহমিহিরের সূর্য্যপদ গূঢ় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থার মূল নহে? অভিপ্রায় এই :—পুরাণে বলিল সূর্য্যের পদদ্বয় চিত্রে বা প্রতিমায় করিবে না, কেন না উহা বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্রোল্লিখিত হয় নাই বলিয়া অসহ্যদর্শন, তবুও যদি কর, তবে স্রষ্টা কুষ্ঠরোগী হইবে ইহা মনে করিও। সুতরাং নিষেধটায় বড় জোর দেওয়া হইল।

এখন বুঝিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যের পদদ্বয় সাধারণে না দেখান'র হেতু হইল উহার তীব্রজ্যোতিঃ সুতরাং তাহা তৈয়ার করিয়াও যদি ঢাকিয়া রাখা যায় তাহা হইলে তো ফলতঃ উহা দেখানই হইল না তো বটেই। তাই কি বরাহের "গূঢ়ং" এর উদ্দেশ্য নয়?

আমার বোধ হয় তাহাই। আমরা যে সূর্য্যপ্রতিমায় সূর্য্যের পদদ্বয়ে জুতার মত কিছু দেখি উহাকে জুতা না বলিয়া যদি বলি উহা একপ্রকার প্রাবরণ বিশেষ, তাহা হইলে পুরাণাদিতে উল্লিখিত সূর্য্যধ্যান সমবায়ে জুতার কথা নাই বলিয়া আর উহার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয় না।

আর এক কথা কলিকাতা যাদুঘরে সূর্য্যের এমন শিলাপ্রতিমাও আছে, স্থপতি যাহার পা একেবারে খোদিত করে নাই।

ইহাতে কি ইহাই মনে করা সহজ নহে [যে বহুপ্রাচীনকাল হইতেই সূর্য্যের পদদ্বয় দেখান নিষিদ্ধ হইয়াছে তাই কোন শিল্পী তাহা আচ্ছাদিত করিয়াছেন, কেহ বা একেবারেই করেন নাই। জুতার কথা যখন আজও পর্য্যন্ত কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহাকে জুতা না বলিয়া প্রাবরণ বিশেষই বা বলিলাম।

সূর্য্যের ধ্যান।

রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্।
মাণিক্যমৌলিং দীননাথমীড়ে বন্ধূককান্তিং বিলসৎত্রিনেত্রম্॥
রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

হেমাম্ভোজপ্রবালপ্রতিমনিজরুচিং চারুখট্টাঙ্গচাপৌ
চক্রং শক্তিং সপাশং সৃণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্।
হস্তাম্ভোজৈর্দধানং ত্রিনয়নবিলসদ্ বেদবক্ত্রাভিরামং
মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময়মুকুটং হারদীপ্তং ভজামঃ ॥ (তন্ত্রসার)
"পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎ সদা রবিঃ ॥ (মৎস্যপু° ৯৪ অঃ)
পদ্মাসনঃ পদ্মকরো দ্বিবাহুঃ পদ্মদ্যুতিঃ সপ্ততুরঙ্গবাহঃ।
দিবাকরো লোকগুরুঃ কিরীটী ময়ি প্রসাদং বিদধাতু দেব. ॥
"ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যস্তূর্ণং রথেন তু।
ভদ্রৈরশ্বৈরক্ষতৈরশ্বৈঃ সর্পতেঽসৌ দিবি ক্ষয়ে ॥
অহোরাত্রাদ্রথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রাস্তং সপ্তভিঃ সপ্তভির্হয়ৈঃ ॥" (বায়ুপুরাণ ৫২ অঃ)
সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্যো দ্বিপদ্মধৃক্। (অগ্নিপুরাণ ৫১ অ°)
"প্রভাকরস্য প্রতিমামিদানীং শৃণুতদ্বিজাঃ।
রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্ ॥
সপ্তাশ্বং চৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ।
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভসমপ্রভম্ ॥
নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে তে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা ॥
চোলকচ্ছন্নবপুষং ক্বচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ।
বস্ত্রযুগ্মসমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ ॥" (মৎস্যপুরাণ ২৬১ অ°)

ইহার এই শেষের শ্লোকটী আমার মতের পোষক। "চরণৌ তেজসারতৌ" ইহার অর্থ 'তেজসা হেতুনা চরণৌ আবৃতৌ' বড় তেজ বলিয়া চরণদ্বয় আবৃত। এই অর্থই পূর্ব্বোল্লিখিত মৎস্যপুরাণোক্ত গল্পের সহিত খাটে, তেজদ্বারা আবৃত এরূপ অর্থ করিতে গিয়া কেহ যেন গোলে না পড়েন। আর "চোলকচ্ছন্নবপুষং" এবং "চরণৌ তেজসাবৃতৌ" এই উভয়ের সহিত ঐক্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে বরাহমিহিরের "কুর্য্যাদুদীচ্যবেষং গূঢ়ং পাদাদুরো যাবৎ।" মৎস্যপুরাণেরই কথান্তর। চোলকের অর্থ কবচ।

মৎস্যপুরাণের গল্পের মূল।

"বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্ব্বমদিত্যামভবৎ সুতঃ।
তস্য পত্নীত্রয়ং তদ্বৎসংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা ॥
রৈবতস্য সুতা রাজ্ঞী রেবন্তং সুষুবে সুতং।
প্রভা প্রভাতং সুষুবে ত্বাষ্ট্রী সংজ্ঞা তথা মনুং ॥

যমশ্চ যমুনাচৈব যমলৌ তু বভূবতুঃ।
ততস্তেজোময়ং রূপমসহন্তী বিবস্বতঃ ॥
নারীমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরাদনিন্দিতাং।
ত্বাষ্ট্রীস্বরূপরূপেণ নাম্না ছায়েতি ভামিনী ॥

* * *

কাময়ামাস দেবোঽপি সংজ্ঞেয়মিতি চাদরাৎ।

* * *

বিবস্বানথ তজ্জ্ঞাত্বা সংজ্ঞায়াঃ কর্ম্মচেষ্টিতং।
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদাচচক্ষে চ রোষবান্ ॥
তমুবাচ ততস্ত্বষ্টা সান্ত্বপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
তবাসহন্তী ভগবন্মহস্তীব্রং তমোনুদং ॥
বড়বারূপমাস্থায় মৎসকাশমিহাগতা।
নিবারিতা ময়া সা তু ত্বয়া চৈব দিবাকর ॥
যস্মাদবিজ্ঞাততয়া মৎসকাশমিহাগতা।
তস্মান্মদীয়ং ভবনং প্রবেষ্টুং ন ত্বমর্হসি ॥
এবমুক্তা জগামাথ মরুদেশমনিন্দিতা।
বড়বারূপমাস্থায় ভূতলে সংপ্রতিষ্ঠিতা ॥
তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যদ্যনুগ্রহভাগহং।
অপনেষ্যামি তে তেজো যন্ত্রে কৃত্বা দিবাকর ॥
রূপং তব করিষ্যামি লোকানন্দকরং প্রভো।
তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরং ॥
পৃথক্ চকার তত্তেজঃ .. ... ।
রূপঞ্চাপ্রতিমং চক্রে ত্বষ্টা পদ্ভ্যামৃতে মহৎ ॥
ন শশাকাথ তদ্দ্রষ্টুং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ।
অর্চ্চাস্বপি ততঃ পাদৌ ন কশ্চিৎ কারয়েৎ কচিৎ ॥
যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্নোতি নিন্দিতাং।
কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেঽস্মিন্ দুঃখসংযুতঃ ॥
তস্মাচ্চ ধর্ম্মকামার্থী চিত্রেষ্বায়তনেষু চ।
ন কচিৎ কারয়েৎ পাদৌ দেবদেবস্য ধীমতঃ ॥ (মৎস্যপুরাণ ১১ অ°)

শ্রীবিনোদবিহারিবিদ্যাবিনোদ।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পারিষদ ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিককুলে শান্তিপুরে জন্মিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণদাসকৃত শ্রীচৈতন্যপারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ নামক প্রাচীন পুঁথিতে—

"শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ। উদ্ধ(া)রণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ॥"

অনুমান হয়, শান্তিপুরে দত্তমহাশয়ের মাতামহের নিবাস ছিল এবং তিনি মাতামহ-গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সপ্তগ্রামে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, তাহাতেই মুকুন্দঠাকুর-বিরচিত পদে—

"শ্রীকরনন্দন দত্ত উদ্ধারণ ভদ্রাবতীগর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস নিতাইর দাস শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত॥"

(সা° প° পত্রিকা ১৩১৬।১।৩৬ পৃষ্ঠ)

নরহরি (চক্রবর্ত্তী) কৃত নিত্যলীলামৃত পুঁথিতে—

"জয় সপ্তগ্রাম মধ্যে উদ্ধারণদত্ত। শ্রীসুগ্রীবমিশ্র নিত্যানন্দগুণে মত্ত॥"

উদ্ধারণ সময়ে সময়ে শান্তিপুরে মাতামহের গৃহে গিয়া থাকিতেন, তাহাতেই শান্তিপুরেব মুকুন্দরায়ের সহিত তাঁহার সখ্য হইয়াছিল, অতএব পুনশ্চ ঐ পুঁথিতে উক্ত হইয়াছে—

"জয় শান্তিপুরে রায় মুকুন্দের স্থিতি। উদ্ধারণ দত্ত কৃষ্ণানন্দ প্রিয় অতি॥"

শ্রীনিত্যানন্দ, নানা তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে নীলাচলে আগমন করেন এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে আগত হইলে তাঁহার সহিত দত্তমহাশয়ের মিলন হয়। অনন্তর তিনি প্রভুর সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাহাতেই দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণববন্দনার পুঁথিতে—

"উদ্ধারণ দত্ত বান্দা হৈয়্যা সাবহিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে যে ভ্রমিলা সর্ব্বতীর্থ॥"

শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু, শ্রীঅভিরাম গোপালের মহত্ত্ব-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেন—

"আমি শুনিয়াছি উদ্ধারণ দত্তস্থানে। তীর্থপর্য্যটন কালে ছিলা প্রভু সনে॥"

(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার পুথি)

উত্তরকালে শ্রীনিত্যানন্দ, নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়া, সপ্তগ্রামে দত্তমহাশয়ের গৃহে আগমন করিলে তিনি শৃঙ্গবেণু, মালা, চন্দন, বসন ও ভূষণ দিয়া প্রভুকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই মাধবদাসকৃত বৈষ্ণববন্দনা[1] পুঁথিতে—

---

(১) চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণববন্দনার পুঁথি দেখিয়াছি। ১ম দৈবকীনন্দনকৃত, ২য় মাধবদাসকৃত, ৩য় কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিকৃত, ৪র্থ লোচনদাসকৃত। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা আবার দুইপ্রকার—বৃহৎ ও লঘু। মাধবদাস ও কৃষ্ণদাসের বৈষ্ণববন্দনা, বিরলপ্রচারহেতু দুষ্প্রাপ্য। কয়েক বৎসর অতীত হইল, "বিদ্যাধরদাস" ভণিতাযুক্ত

জয় উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে বাস। যাঁর ঘর নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস ॥
দ্রব্য মাল্য চন্দন বসন অলঙ্কারে। যে করিল বিভূষিত নিতাইচাঁদেরে ॥"

নিত্যানন্দ প্রভু, যৎকালে পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে বসিয়া চিড়া দধি মহোৎসব করহিতেছিলেন, তৎকালেও উদ্ধারণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন : শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুঁথিতে—

"চৌতরা উপরে প্রভুর যত নিজগণ। বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলবন্ধন ॥
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর। মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস। মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস।
উদ্ধ(া)রণ আদি আর যত নিজগণ। উপরে বসিলা সব কে করু গণন ॥"

(অন্ত্যখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে।
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥"

নিত্যানন্দপ্রভু, মহাপ্রভুর আদেশে বিবাহার্থ যৎকালে অম্বিকা অভিমুখে গমন করেন, তৎকালেও দত্তমহাশয় তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। প্রভু, সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারে থাকিয়া তাঁহাকে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত দত্তকে তদীয় অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। সূর্য্যদাস, বহির্বাটিতে আসিলে, দত্ত, প্রভুর এইরূপ পরিচয় দেন—

"উদ্ধারণ কহে ইহোঁ ব্রাহ্মণ উত্তম। রাঢ়ী শ্রেণি সর্ব্বশাস্ত্রে অতিশ্রেষ্ঠতম ॥
ন্যায়চূড়ামণি ইহাঁর শাস্ত্রের আখ্যাতি। নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি ॥"

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

বিবাহের পূর্ব্বে, একদা ব্রাহ্মণগণ, প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—

"শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আওজন। স্বপাক করেন কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি। না পারিলে উদ্ধারণ রাখহ উতারি ॥

একখানি বৈষ্ণববন্দনার পুঁথি দেখিতে পাই—উহার লিপিকাল সন ১২৩০ সাল। উহাতে "নারায়ণি সুতবন্দো বিন্দাবনদাস" এই পাঠ থাকায় মনে হইয়াছিল, এই বৈষ্ণববন্দনাকর্ত্তা দ্বিতীয় বৃন্দাবন দাস হইতে পারেন। তারপর, গত বৎসর, যখন মাধবদাসের বৈষ্ণববন্দনা, পুঁথিদৃষ্টে, সম্পাদন করি, তখন দেখি যে "বিন্দাবনদাস", মাধবদাসের বৈষ্ণববন্দনার কোন কোন পাঠের কিছু কিছু অন্যথা*, কোন কোন স্থানে এখানকার পদ্য ওখানে, ওখানকার পদ্য এখানে—এইরূপ উল্টাপাল্টা করিয়া মাধবদাসের গ্রন্থের আদ্যোপান্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন। লোচনদাসের বৈষ্ণববন্দনা ক্ষুদ্র। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার এক লেখক লিখিয়াছেন যে, লোচনদাসের প্রকৃত নাম "ত্রিলোচন দাস"। আমরা লোচনদাসের অনেক পুঁথি দেখিয়াছি, কোনও পুঁথিতে ঐ রূপ নামের বানান নাই। সম্প্রতি "আত্মপ্রবোধিকা" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথিতে দেখিলাম, উহাঁর প্রকৃত নাম "লোচনানন্দ"। যথা—

"দুর্লভসারেতে কহেন শ্রীলোচনানন্দ। শুনিলে জানিবে তার বাক্যের ছন্দবন্দ ॥"

* একটি পাঠান্তর এখানে উল্লেখযোগ্য—মাধবদাসের পুঁথিতে যে স্থানে "আমুয়া মুলুক" পাঠ আছে, বৃন্দাবন দাসের পুঁথিতে ঠিক সেই স্থানে "অম্বিকানগর" পাঠ আছে।

এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়। শুনিঞা সভার মনে লাগিল বিস্ময়॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি। পূর্ব্বাশ্রমে কোন নামে কোথা বা বসতি॥
প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার। সুবর্ণবণিক্ দেখি করিনু স্বীকার॥"

(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার পুঁথি)

দেখা গেল, উদ্ধারণের জন্মস্থান শান্তিপুর এবং বাসস্থান সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী। ইদানীং কেহ কেহ বলিতেছেন, দত্তমহাশয়ের বাসস্থান কাটোয়ার সন্নিহিত উদ্ধারণপুর। এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বিতীয়া গৃহিণী শ্রীজাহ্নবা, বৃন্দাবন হইতে জলপথে প্রত্যাগমনকালে, যে যে স্থানে গমন করেন, নরহরির ভক্তিরত্নাকর পুঁথিতে সেই সকল স্থানের মধ্যে, উদ্ধারণপুরের নাম নাই। শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী, খেতরি, বুধরি, কণ্টকনগর, জাজিগ্রাম, খণ্ড, নদীয়া ও অম্বিকা হইয়া সপ্তগ্রামে গমন করেন।

"ভাগ্যবন্ত বণিকের বালবৃদ্ধ যত। তা সভার যে আর্ত্তি তা কে কহিবে কত॥
ঈশ্বরী দর্শনে সভে আপনা পাশরে। ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে॥
উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে স্থিতি কৈল। ঈশ্বরী দর্শনে বহু লোক ভীড় হৈল॥
উদ্ধারণ দত্তের চরিত্র সোঙরিয়া। শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া॥
নিত্যানন্দপ্রিয় উদ্ধারণের কথায়। জৈছে প্রভুগণ চেষ্টা কহনে না যায়॥
উদ্ধারণ ঘরে রহি নৌকায় চঢ়িলা। সভে অনুগ্রহ করি খড়দহে গেলা॥"

(ভক্তিরত্নাকর পুঁথি—১১শ তরঙ্গ)

জগন্নাথ দাস নামক এক বৈষ্ণব, উদ্ধারণপুরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন—নরহরি, নিত্যলীলামৃতে তাহার উল্লেখ করেন,[১] কিন্তু দত্তমহাশয়ের তথায় বাস থাকিলে, নরহরি, যে তাহার উল্লেখ করিবেন না—ইহা অসম্ভব।

শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়[২] খেতরি হইতে শ্রীক্ষেত্রগমনকালে যে যে স্থান হইয়া গিয়াছিলেন, সে সকল স্থানের মধ্যেও উদ্ধারণপুরের নাম নাই। তিনি দত্তমহাশয়ের সপ্তগ্রামেই গিয়াছিলেন—

"নিত্যানন্দগুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধারণ। নিরন্তর সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের (বাস) সপ্তগ্রামে॥ নরোত্তম আবেশে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে॥
লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণের আলয়। করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয়॥
প্রভুর বিচ্ছেদদুঃখে দগ্ধি অনুক্ষণ। এই কথো দিন হৈল হৈলা সঙ্গোপন॥
তাঁর অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার। শুনি নরোত্তম-নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
হইলা ব্যাকুল জৈছে কহনে না যায়॥ প্রভুপ্রিয় যে ছিলেন মিলিলা তাহায়॥"

(ভক্তিরত্নাকর পুঁথি—৮ম তরঙ্গ)

---

(১) "জয় প্রেমভক্তিদাতা জগন্নাথ দাস। উদ্ধারণপুরে কথো দিবস নিবাস॥" (নিত্যলীলামৃত পুঁথি)
(২) বৃন্দাবনে ইঁহার "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি হইয়াছিল।

শ্রীউদ্ধারণ দত্তমহাশয়ের জন্মস্থান শান্তিপুর আর বাসস্থান সপ্তগ্রাম,—তবে যে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায়, তাঁহার শ্রীপাট "উদ্ধারণপুর" লিখিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? কেহ বলেন—উদ্ধারণপুরে তাঁহার জমিদারির কাছারি ছিল। কেহ বলেন—তিনি জীবনকালের শেষভাগে উদ্ধারণপুরে মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবা করেন,—তাহা যদি হইত, তবে নরহরিদাস (চক্রবর্ত্তী) নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন,—তাহা যখন করেন নাই, তখন ঐ শেষোক্ত কথা নিতান্তই অমূলক। শুনিতে পাই, উদ্ধারণপুরে উদ্ধারণ-ঘাট প্রভৃতি কীর্ত্তি আছে। উদ্ধারণপুর ও উদ্ধারণঘাট হইতে অনুমান হয়, ঐ স্থানের সহিত দত্ত-মহাশয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, মাধবদাস ও নরহরিদাস, যখন দত্তমহাশয়ের সপ্তগ্রামে বাস বলিয়াছেন এবং উদ্ধারণপুরে[১] যখন তাঁহার বসতির কোন প্রাচীন লিখন নাই, তখন সপ্তগ্রামই তাঁহার শ্রীপাট বলিয়া স্থির নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে। আমরা বাল্যকাল হইতে সাতগাঁয়ে উদ্ধারণ দত্তমহাশয়ের পাট, দাস-গোসাঞের পাট[২] ও ঝড়ু ঠাকুরের পাট[৩] দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি শুনিতে পাই, ওখানে কালিদাসের পাট[৪] নামক এক পাটবাড়ী আছে। আমাদের গৃহে যে প্রাচীন লিখন আছে, তদনুসারেও জানা যায় যে দত্তমহাশয়ের শ্রীপাট সপ্তগ্রাম।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর বৈষ্ণববন্দনার এক প্রাচীন পুঁথিতে—

"উদ্ধারণ দত্ত বন্দো ভাগবতোত্তম। যাহা হৈতে চরিতার্থ বণিকের গণ ॥"

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ভাগবতোত্তমের লক্ষণ, যথা—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

যিনি, সকল প্রাণীতে ভগবানের ও আপনার সত্তা দেখিতে পান এবং ভগবানে ও আপনাতে প্রাণী সকলকে দেখেন, তিনি ভাগবতোত্তম।

কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস। গদাধর দাস, দত্ত মহাশয়কে[৫] নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ও পরমেষ্ঠিতত্ত্বজ্ঞাতা বলিয়া জানিতেন, যথা—

"ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত, পরমেষ্ঠিজ্ঞাতাতত্ত্ব, সদা গোবিন্দের গুণ পাঠ।" (জগন্নাথমঙ্গল পুঁথি)

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

---

(১) বেহার দেশে আর এক উদ্ধারণপুর আছে—এ পর্য্যন্ত কেহ উহাকে দত্তমহাশয়ের শ্রীপাট বলেন নাই।

(২) শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর পাট। কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

(৩) ইনি ভূমিমালি জাতীয় বৈষ্ণব।

(৪) কালিদাস, দাসগোস্বামীর জ্যাতিখুড়া ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

(৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬ষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যায় "জেমোর পুঁথি" "বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ের পুঁথি"র কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুঁথির পাঠের সহিত ঐ সকল পাঠ মিলাইয়া দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, উক্ত দুই পুঁথির পাঠ ভ্রান্তিমূলক। আমাদের পুঁথি হইতে জানা যায়, উৎকলপতি নরসিংহদেবের রাজ্যকালে এবং "রাজচক্রবর্ত্তী সাহজাদা (সা জেহান) দিল্লীপতি"র রাজ্যের ১৫শ বৎসরে (১৬৪২ খৃষ্টাব্দে) "উৎকলে অনেক গতি কটকনগর"এর মাথনপুরে পুরাণপাঠ শুনিয়া, গদাধর, এই গ্রন্থ রচনা করেন। গদাধরের সিদ্ধি (সিদ্ধি নহে) গ্রামে বাস ছিল।

মধ্যমরাজের তাম্রশাসন

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত পরিকুড়ের রাজা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্লকের নিকট এই তাম্রশাসনখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরীর কলেক্টর ব্লাকউড সাহেব ইহার সন্ধান করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরের শীতকালে তাম্রশাসনখানি ব্লকসাহেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তাম্রফলকের খোদিতলিপির পাঠোদ্ধার অতীব কষ্টকর এই জন্যই প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল। তিনখানি ক্ষুদ্র তাম্রপত্রের উপর খোদিত লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছে ও এই তিনখানি পত্রের দক্ষিণভাগে এক একটী ছিদ্র আছে। ছিদ্রাভ্যন্তরে একটী স্থূল তাম্রদণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া তাম্রপত্রগুলি গাঁথা হইয়াছে। এই বক্রতাম্রদণ্ডের উপরে মোহরের নিম্নাংশমাত্র বর্ত্তমান আছে। প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

শৈলোদ্ভববংশজ মধ্যমরাজদেব তাঁহার রাজ্যের ষড়্‌বিংশতিতম বর্ষে নানা গোত্রচরণভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে কোঙ্গোদমণ্ডল ও কটকভুক্তির অন্তঃপাতী কোন গ্রাম দান করিতেছেন। খোদিতলিপির প্রথমাংশে শৈলোদ্ভব বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শৈলোদ্ভবের বংশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা জানিয়া রাখা উচিত। এই তাম্রশাসন ব্যতীত এই বংশের আর তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

১। গঞ্জামে আবিষ্কৃত ৩০০ গুপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রদত্ত দ্বিতীয় সৈন্যভীতের তাম্রশাসন (১)।

২। মাদ্রাজের বুগুডা গ্রামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মদেবের তাম্রশাসন (২)।

৩। পুরীর খুর্দাগ্রামে আবিষ্কৃত মাধবরাজের তাম্রশাসন (৩)।

ইহার মধ্যে প্রথম তাম্রশাসনখানিই তারিখযুক্ত। ইহা ডাক্তার হলজ্ (Dr. Hultzsch) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় মাধবরাজ ১মের পৌত্র, যশোভীতের পুত্র, মাধবরাজ ২য়, ৩০০ গুপ্তাব্দে (৬১৯ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজ্যকালে, কোঙ্গোদমণ্ডলে, কৃষ্ণগিরিবিষয়ে ছবলকুথয় গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের মুদ্রায় মাধবরাজের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম মুদ্রিত আছে। ইহা হইতে ডাক্তার হলজ্ অনুমান করেন যে সৈন্যভীত মাধবরাজের নামান্তর। দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে শৈলোদ্ভববংশীয় মাধববর্ম্মা কোঙ্গোদমণ্ডলে, গুড্ডবিষয়ে খদিরপট্টকভুক্ত পুইপিণ

---

১ Epigraphia Indica Vol. II p. 143.

২ Ibid. Vol. III p. 44 and. Vol. VII.

৩ J. and P, A. S. B. (New Series) Vol. I. p. 284.

গ্রাম বামনভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণ এই খোদিতলিপি প্রকাশ করেন, তাঁহার মতে মাধববর্ম্মদেবের পিতার নাম সৈন্যভীত ও পিতামহের নাম যশোভীত। ডাক্তার হুল্‌জ গঞ্জামের খোদিতলিপি-প্রকাশকালে বলেন যে এই মাধববর্ম্মদেবের অপর নাম সৈন্যভীত ২য়। তাঁহার পিতার নাম যশোভীত ও পিতামহের নাম সৈন্যভীত ১ম। ডাক্তার হুল্‌জের উক্তিই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় ও ইহার প্রমাণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয় খোদিতলিপিখানি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ৺গঙ্গামোহন লস্কর দ্বারা প্রকাশিত হয় ও ইহা হইতে জানা যায় যে মাধবরাজ কোঙ্গোদমণ্ডলে, থোবণ বিষয়ে আরহন্ন গ্রামের কোন বস্তু প্রজাপতিস্বামিনামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই খোদিতলিপি অনুসারে মাধবরাজের পিতার নাম যশোভীত ও পিতামহের নাম সৈন্যভীত, কিন্তু মুদ্রায় মাধবরাজের নামের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম অঙ্কিত আছে। তিনখানি খোদিতলিপিই শৈলোদ্ভবকুলজ মাধব নামক নৃপতির আদেশে উৎকীর্ণ, কিন্তু দুইখানিতে ইনি মাধবরাজ নামে ও একখানিতে মাধববর্ম্মা নামে পরিচিত। এই তিনখানির মধ্যে বুগুডার তাম্রশাসনে শৈলোদ্ভব বংশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় :—
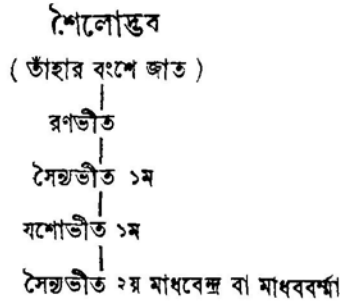
কথিত আছে, কলিঙ্গদেশে পুলিন্দসেন নামধেয় এক বিখ্যাত বীর ছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজপদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, কিন্তু রাজপদোপযুক্ত ব্যক্তির কামনায় ব্রহ্মার উপাসনায় ব্রত হন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া প্রস্তরখণ্ড হইতে শৈলোদ্ভব নামক মহাপুরুষের সৃষ্টি করেন। এই কয়টি শ্লোক পরিকুডের খোদিতলিপিতেও আছে। গঞ্জাম ও খুর্দ্দার খোদিতলিপি অনুসারে মাধবরাজের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় :—
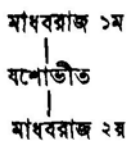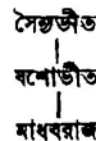
উভয় তাম্রশাসনই কোঙ্গোদ বা কৈঙ্গোদ হইতে প্রচারিত এবং উভয় তাম্রশাসনের মুদ্রাতে মাধবের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝিতে হইবে যে সৈন্যভীত,

মাধবরাজ বা মাধবেন্দ্রের নামান্তর মাত্র। সুতরাং বুগুডার খোদিতলিপির মাধববর্ম্মা ও সৈন্যভীত একই ব্যক্তি। ডাক্তার কীলহর্ণ বুগুডা তাম্রশাসনের মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু বোধ হয় ইহাতেও "সৈন্যভীত" উৎকীর্ণ ছিল। পরিকুডের তাম্রশাসনে মাধবরাজের পরিবর্ত্তে, যশোভীতের পরে পুনরায় সৈন্যভীতেরই উল্লেখ আছে :—

শৈলোদ্ভব
(তদ্বংশজ)
|
রণভীত
|
সৈন্যভীত ১ম
|
যশোভীত ১ম
|
সৈন্যভীত ২য়
|
যশোভীত ২য়
|
মধ্যমরাজ

গঙ্গামোহন বাবু খুর্দার তাম্রশাসন প্রকাশকালে গঞ্জামের তাম্রশাসনের অস্তিত্ব-বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বুগুডা ও খুর্দার তাম্রশাসন হইতে শৈলোদ্ভববংশের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন :—

শৈলোদ্ভব
(রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা)
|
রণভীত
(শৈলোদ্ভবকুলজ)
|
সৈন্যভীত ১ম
(রণভীতসূনু)
|
যশোভীত ১ম
(সৈন্যভীতের বংশে জাত)
|
সৈন্যভীত ২য়
(যশোভীত-তনয়)
|
যশোভীত ২য়
(সৈন্যভীতের পুত্র)
|
মাধবরাজ, মাধবেন্দ্র ও মাধববর্ম্মা
(যশোভীতের পুত্র)

এতন্মধ্যে যশোভীত ২তীয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুগুড়া বা খুর্দ্দা তাম্রশাসনে কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না (১)। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। মাধবরাজ, মাধববর্ম্মা ও মাধবেন্দ্র, সৈন্যভীত ২তীয়েরই অপর নাম। ইনি যখন ৬১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার পৌত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিম্বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

মধ্যমরাজ দেব এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীসামন্ত, মহাসান্ত, মহারাজ, রাজন্যক, রাজপুত্র, অন্তরঙ্গ, দণ্ডনায়ক, উপরিক, বিষয়পতি ও তদাসুক্তক প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ও অতীত (?) রাজপাদোপজীবিগণকে জানাইতেছেন যে তাঁহার ষড্‌বিংশতি রাজ্যাঙ্কে তিনি কোঙ্গোদমণ্ডলে, ক্ষাকটকভুক্তিতে কোন গ্রাম, শিলস্বামি, গোবর্দ্ধনস্বামি, বন্ধুস্বামি, কবড়িস্বামি, নারায়ণস্বামি, মাধবস্বামি, ভরণীস্বামি, ভগর্গস্বামি, আদিত্যস্বামি, রুদ্রস্বামি, শিবস্বামি ও শুভস্বামি-নামধেয় ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। তৃতীয় ফলকের অপর পৃষ্ঠে চারি পংক্তি খোদিতলিপি আছে। ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শেষ পঙ্‌ক্তির শেষভাগে "সম্বৎ ৮০০" অনুমান হয়, ইহা বিক্রমাব্দের নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

---

(১) সন্দেহভঞ্জনার্থ পুরার তাম্রশাসনের পাঠ দিলাম :—

১। স্বস্তি জয়স্কন্ধাবারাৎ কোঙ্গোদবাসকাৎ সকলক্ষমাতলো
২। পলক্ষিত ক্ষমানরনিনরবিক্রমস্ত প্রতাপধারিতারিসৈন্য
৩। স্য শ্রীসৈন্যভীতস্য পৌত্র প্রসৃতবিপুলামলযশস:
৪। সততমযশোভীতস্য শ্রীমতো যশোভীতস্যাত্মজো
৫। ভগবৎ মহেশ্বরচরণযুগলৈকশরণ্য: শৈশবএব বিদ্যাচতুষ্ট-
৬। য়াভ্যাসোন্মীলিতসহজপ্রজ্ঞাতিশয়াবগতসমস্ত
৭। র্থতত্ত্ব: স্বমতবিরচিতাত্যদ্ভুতকাব্যার্থবোধৈককার্য্যসঙ্গতি
৮। ভবিষ্বিদদ্ধোজনসমূহোনিজভুজবলাবলে পাবমি.......... .
৯। স্তপর্য্যন্ত সামন্তশিরোমণিমরীচিসংমুচ্ছিত চরণ] ....
১০। চ্ছিন্নান্তরে তরাবাতিবর্গো যথাক্রমপ্রবৃত্ত মনুরঞ্জিত..... .
১১। মহানিপানমিব সর্ব্বসত্বৈপথেষ্টমুপভুজ্যমা[ন]· ..... .
১২। বস্তোগসারসত্বসারপ্রবাকপ্রকাশিতশৈলোত্তমাম্বরায়· .. ... .
১৩। নতসকলকলিঙ্গাধিপত্য: সকলকলাবাপ্তকৌ-মূর্ত্ত
১৪। ব জগতাশ্রমর: প্রবৃত্তচক্রশ্চক্রধর। ইহ ভগবান্মাধব
১৫। শ্রীমাধবরাজ: কুশলী ইত্যাদি J. and P A S B (N S) Vol. I p 284

বুগুড়ার তাম্রশাসনে বংশপরিচয়সূচক যে কয়েকটি শ্লোক আছে, তাহার একটী ব্যতীত আর সকল গুলিই পরিকুদের খোদিতলিপিতে পাওয়া যায়। বুগুড়ায় খোদিতলিপির ১০ম শ্লোকটিমাত্র পরিকুদের খোদিতলিপিতে নাই—

"জাতেন যেন কমলাকরবৎ স্বগোত্রমুন্মীলিতং দিনকৃতেব মহোদয়েন।
সংক্ষিপ্তমণ্ডলরচস্তগতাঃ প্রণামমাপুরীপোগ্রহগণাইব তস্য দীপ্ত্যা।"

Epigraphia Indica. Vol. III p. 41
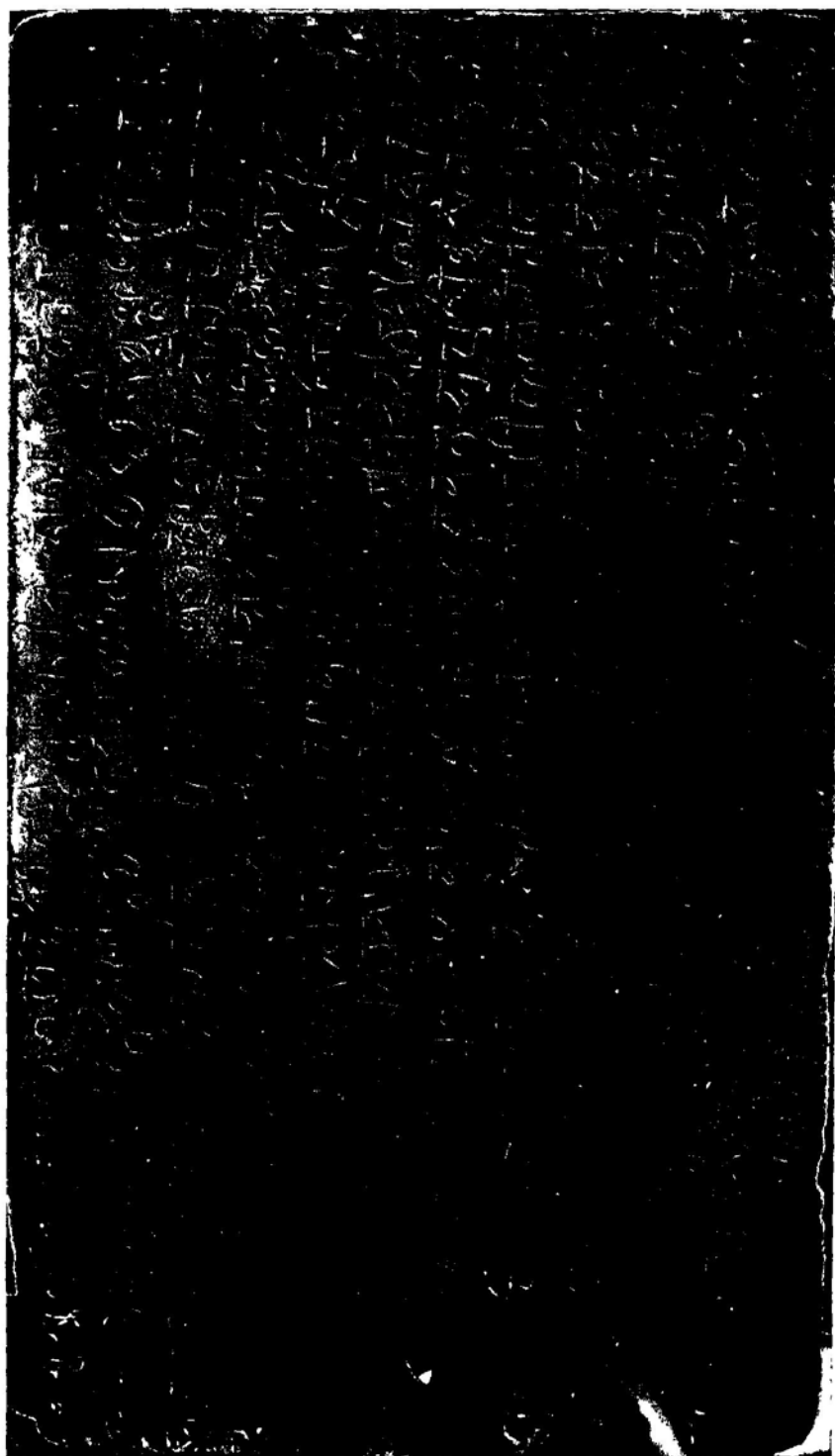
প্রথম ফলক

১। ওঁ স্বস্তি ইন্দোর্দ্ধৌতমৃণালতন্তুভিরিব শ্লিষ্টাঃ করৈ(ঃ) কোমলৈর্বদ্ধা-
হেররুণৈ(ঃ) স্ফুরৎ ফ

২। ণিমণৈর্দিগ্ধপ্রভাসোংশুভিঃ (।) পার্ব্বত্যা(ঃ) সকচগ্রহব্যতিকব-
ব্যাবৃত্তবন্ধশ্লথা গঙ্গাম্ভু(ঃ) প্লু‌তি

৩। ভিন্নভস্মকণিকা (ঃ) শম্ভোর্জটা (ঃ) পান্তু ব (ঃ)। (।) শ্রীমান উ(চ) চৈ
র্নভস্তো গুরুরচলপতে(ঃ) ক্ষোভজিৎ য়ঃ

৪। ক্ষমায়া গম্ভীরা স্তি(? স্তো) যরাশেবথ দিবসকরাস্তাস্বদালোককারী (।)
হ্লাদী সর্ব্বস্য চেন্দো স্ত্রি

৫। ভুবনভবনপ্রেরকশ্চাপি বা য়ো রাজা (? রাজেন্দ্রঃ) স স্থাণু
মূর্ত্তির্জয়তিকলিমলক্ষালনো মাধ

৬। বেন্দ্রঃ (॥) প্রাত্ শুর্ম্মহেভকরপীবরচারুবাহু কৃষ্ণাশ্মসঙ্কযবিভেদ-
বিশালবক্ষা (।) রাজীব

৭। কোমলদলায়তলোচনাস্তু[ঃ] খ্যাত[ঃ] কলিঙ্গজনতাসু পুলিন্দসেন[ঃ]
তেনেথং

৮। গুণিনাপি সত্বমহতা স্যষ্টং (নেষ্টং) ভুবোর্ম্মগুলং শক্তো যঃ
পরিপালনায জগত[ঃ] কোনা

৯। ম স স্যাদিতি প্রত্যাদিষ্টবিভূৎসবেন ভগবানারাধিতঃ সাশ্বতং।
স্তুচিতা (তচ্চিন্তা)সুগুণং

১০। বিধিৎ সুবদিশস্বাপ্তাস্বয়ম্ভুরপি [॥] স শিলা সকলোদ্ভেদী
তেনাপ্যালেক্য ধীম

১১। তা পরিকল্পিতসদ্বঙ্‌শে প্রভুশ্‌শৈলোদ্ভব[ঃ] কৃতঃ। [।]
শৈলোদ্ভবস্য কুলজো রণ

১২। ভীত আসীত্তেনা সক্ [ৎ] কৃতভীয়াং দ্বিষদঙ্গনানাং [।]
জ্যোস্নাপ্রবোধসম

দ্বিতীয় ফলক, প্রথম পৃষ্ঠা

১৩। য়ে স্বধীরৈব সার্দ্ধমাকম্পিতোনয়নপঙ্কজলেসু চন্দ্র [ঃ] [॥]
তস্যাভবদ্বিবুধপালসমস্ত সু

১৪। ত শ্রীসৈন্যভীত ইতি ভূমিপতির্গরীয়ান্ সং প্রাপ্যানৈকশতনাশ
ঘটাবিঘট্ট লব্ধপ্রসাদ

১৫। বিজয়[ং] মুমুদে ধরিত্রী[ং] [॥] তস্যাপি বঙশে থ যথা[]র্থ নাম[।]
জাতো যশোভীত ইতি ক্ষিতীশ[ঃ] যেন প্ররূ-

১৬। ঢোপি শুভৈশ্চরিত্রৈর্ভূষ্ট[ঃ] কলংক[ঃ] কলিদর্পণস্য [॥]
জাতোথ তস্য তনয[ঃ] সুকৃতী সমস্তসিমন্তি

১৭। নী নয়নষট্পদপুণ্ডরীক[ঃ [।] শ্রীসৈন্যভীত ইতি ভূমীপতির্মহেভ-
কুম্ভস্থলীদলনদু

১৮। র্ল্ললিতাসিধার[ঃ] [॥] কালেয়ৈর্ভূতধাতৃ পতিভিরুপচিতানেক
পাপাবতারৈ র্নীতা যেশাং কথাপি প্র

১৯। লয়মভিমতা কীর্ত্তিপালৈরজস্রং [॥] যজ্ঞৈস্তৈরশ্বমেধপ্রভৃতিভি-
রমরালম্ভিতা স্তৃপ্তিমু

২০। র্ব্বীমত্রিপ্তারাতিপক্ষক্ষয়কৃতিপটুনা শ্রীনিবাসেন যেন। [।]
তস্যোৎখাতাখিলাবৈর্ম্মরুদিব স

২১। নত্তৌ (?) ভাস্বদুস্রাংশুতেজা শ্রীবামানীদপাল (শ্রীরামাদীনপাল)
নরপতিযশোভীতদেবস্তনূজঃ মাতঙ্গাস্তেত (?) ভু

২২। জাম্বহ (হু) মদমুচশ্চারুবক্ত্র[ঃ] প্রচণ্ডঃ (প্রচণ্ডান্) বদ্ধাকর্ষত্য
খেদন্পুনরপি তপস্তে পদ্ম[ব]ত্ স প্রগল্ভঃ [॥]

২৩। কেচিদ্বল্ক পুরা(?)ণ সার্দ্ধমচিবস্তাআ (?) স্থিতিলীলয়া
কেচিদার্দ্ধমুখাস্সহস্রকিরণমালা

২৪। বলি প্রেক্ষণা[ঃ] কেচিদ্বল্ক (কেচিদ্বল্ক)লিনস্তথাজিনধরা [ঃ]
কেচিজ্জটাধারিণো নানারূপধরাস্তপস্বি যত

২৫। যো দিব্যাস্পদাকাঙ্ক্ষিণ[ঃ] [॥] কেচিৎ সৈলগুহোদরেষু নিয়তা
ধূমাবলী পাইন (পায়িনঃ) অন্যে চ যে পাল

২৬। স্র ভক্ষনিরতাঃ কেচিন্নিরাহারকা ইথ যোগযুগোবিহায় বসতিংধ্যায়ন্তি
দিব্যং পদং চিত্রং

২৭। মধ্যমরাজদেবগুণবু(ভূ) রাজ্যং পিতু [ঃ] প্রাপ্তবা[ন্ ॥]
যস্যাহবানাম্নময় সুরভবন প

২য় ফলক পশ্চাদ্‌ভাগ

২৮। তা দিব্যসত্বা প্রগল্‌ভা [ঃ] তৈ[ঃ]সার্দ্ধং নিত্যকালং স্তুক্[তা] গুণ
কলালাপভৃদ্ যঃ প্রকুর্ব্ব[ন] শম্ভৌ

২৯। স্তুস্তকারী পদমমরজবঃ শাশ্বতঃ শান্তরূপং লব্ধোৎসাহং স বীর[ঃ]
ক্ষিতিতলবসতিং নিজ্জিতারা

৩০। তি পক্ষ[ঃ] [॥] স্থিত্যুৎপতি(ত্তি) বিনাশকারণপরমজ্যোতি
ব্যাহতব্যক্তাব্যক্তসমস্তশক্তিনিয়তদেবাতি

৩১। দেবো মহ[ন্] তস্যানুগ্রহকারি বিক্রমধনু[শ] চেষ্টাকরোদ্‌ভূতা[ং]
স শ্রীমানতুলশশাঙ্কধবল ক্ষৌ

৩২। নি (?) যশখ্যাপিতা [।] আকর্ণাদতুলং বিকৃষ্য তব বা পদ্ময়ে
লীলযা অষ্টভির্বপু বৈর্বিবেষ্ট্য

৩৩। ফলকো নাবাদ্‌প্রভাস্যামপিপাণিভ্যচতুরঃ শিলিমুখৈর্মুখে
সুতিক্ষ্ণো ভূশঃ জতো দিব্যগতি প্রি

৩৪। থা তু শতসমং কোঙ্গদবত্নক্ষিতৌ ধর্ম্মাভ্যাসকলশরীরমসকৃৎ
সংবেষ্ট্য লীলান্বিত পীন

৩৫। ...য়োনির্ব...গব...স্তস্বদ্বলীলয়া সদ্য শত কৃপাণভা সুখকরো ধাবত্য

৩৬। খিন্নো ভূশং ভূপালাহমুপমপবক্রিয় ইতি খ্যাত ক্ষমামণ্ডলে।
জাতেন বপুব্যশালি

৩৭। নেব যেন সংবর্দ্ধিতকুমুদশগুমিবাত্মলক্ষসঙ্কোচিঞ্চ রিপুপঙ্কজা
বৃন্দমারাধিত

৩৮। জয়তি লব্ধজযপ্রতাপ। কটশ্রীশৈলোদ্ভবকুলতিলকমহাবংশ্য বাজপেয়াশ্ব

৩৯। মেধাবভৃথস্নাননির্ব্বর্ত্তিতপ্রখ্যাতকীর্ত্তিকর্মা পরমমাহেশ্বর
মাতাপিত্রিপাদনুধ্যাত

৪০। শ্রীমধ্যমরাজদেব কুশলী অস্মিং কোঙ্গদমণ্ডলে শ্রীসামন্ত মহাসামন্ত
মহারাজ রা

৪১। জন্যক রাজপুত্রান্তরদণ্ডনায়কোপরিকবিষয়পতি[ত]
দাযুক্তকবর্ত্তমানভবিষ্যদ্ বা

৪২। ত্তরিণ [ঃ] সকরণ্য (?) ব্রাহ্মণপরো আদিজনপদাঞ্চ যথার্হং
[মানয়ন্তি বোধ]য়[ন্তি] আ

৩য় ফলক সম্মুখভাগ

৪৩। জ্ঞাপয়তি চ বিদিতমস্তু ভবতা[ং] জ্ঞকট্টকভুক্তি বিপ…র্ব্ব পূর্ব্বমণ্ড··

৪৪। ম দ্বাদশতিমিরপ্রমাণ সর্ব্বপীড়বর্জ্জিতশ্চাটভটাপ্রবেশ্য

ন কিঞ্চিদনপ(নপ্র) [গ্রা]

৪৫। হ্য ষড়বিংশতিমে সম্বৎসরে বিজয়বর্দ্ধমানরাজ্যে মাতৃপিত্রোরাত্মনশ্চ

পুণ্যাভি (ব্রি)

৪৬। [দ্]ধয়ে সলিলধারাপুব[ঃ]সরেণ চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকাল

মস্মাভি নানাগোত্রপ্রবর

৪৭। চরণায় ব্রাহ্মণা[য়] শীলস্বামিগোবর্দ্ধনস্বামিবন্ধুস্বামিকচদিস্বামি নারায়ণ

৪৮। স্বামিমাধবস্বামিভরণিস্বামিভর্গস্বামিআদিত্যস্বামিরুদ্রস্বামিশিবস্বামি

৪৯। শু(?)ভস্বামিনে বিশ্রকে প্রতিপাদিতমতোহস্য যথাকালমুপযুজ্যতো

ন কৈনশ্চিদ্ বিরুদ্ধতা কর

৫০। ণীয়া। উক্তঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুভির্বসুধা দতা(ত্তা) বাজভি[ঃ]

সগরাদিভি[ঃ] যস্য যস্য যদা ভূমি[ঃ]

৫১। তস্য তস্য তদা ফলং [॥] মা ভুদফলশঙ্কা ব[ঃ] পরদত্তেতি পার্থিবাঃ

স্বদানাৎ ফলনি অনস্ত্যং পরদত্তা

৫২। নুপালনং [॥] স্বদতাং পরদতাম্বা যো হরেতি বসুন্ধরাং শ্ববিষ্ঠায়াং

ক্রিমির্ভূত্বা পিত্রিভি[স্] সহ

৫৩। পচ্যতি [॥] হরতি হারয়তি ভূমি মন্দবুদ্ধি[ঃ] তমাব্রিতা স বদ্ধো

চারুণৈ পাসৈ তি[র্]য[গ্] যোনিষু জ

৫৪। য়তি ইহি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ

সকলমিদমু

৫৫। দাহ্রিতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈ[ঃ] পবকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা[ঃ] [॥]

বিদ্যুদ্বিলাসতরলামবগম্য স ;ক্ [লোক]

৫৬। স্থিতিং যশসি শক্তমনোভিরুচৈ ॥ [।"] নিত্যং পরো[পক্রিতিঃ]

মাত্ররাতি রতৈধর্মাভিরাধনপরৈরনুমোদিত

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যমরাজের তাম্রশাসন
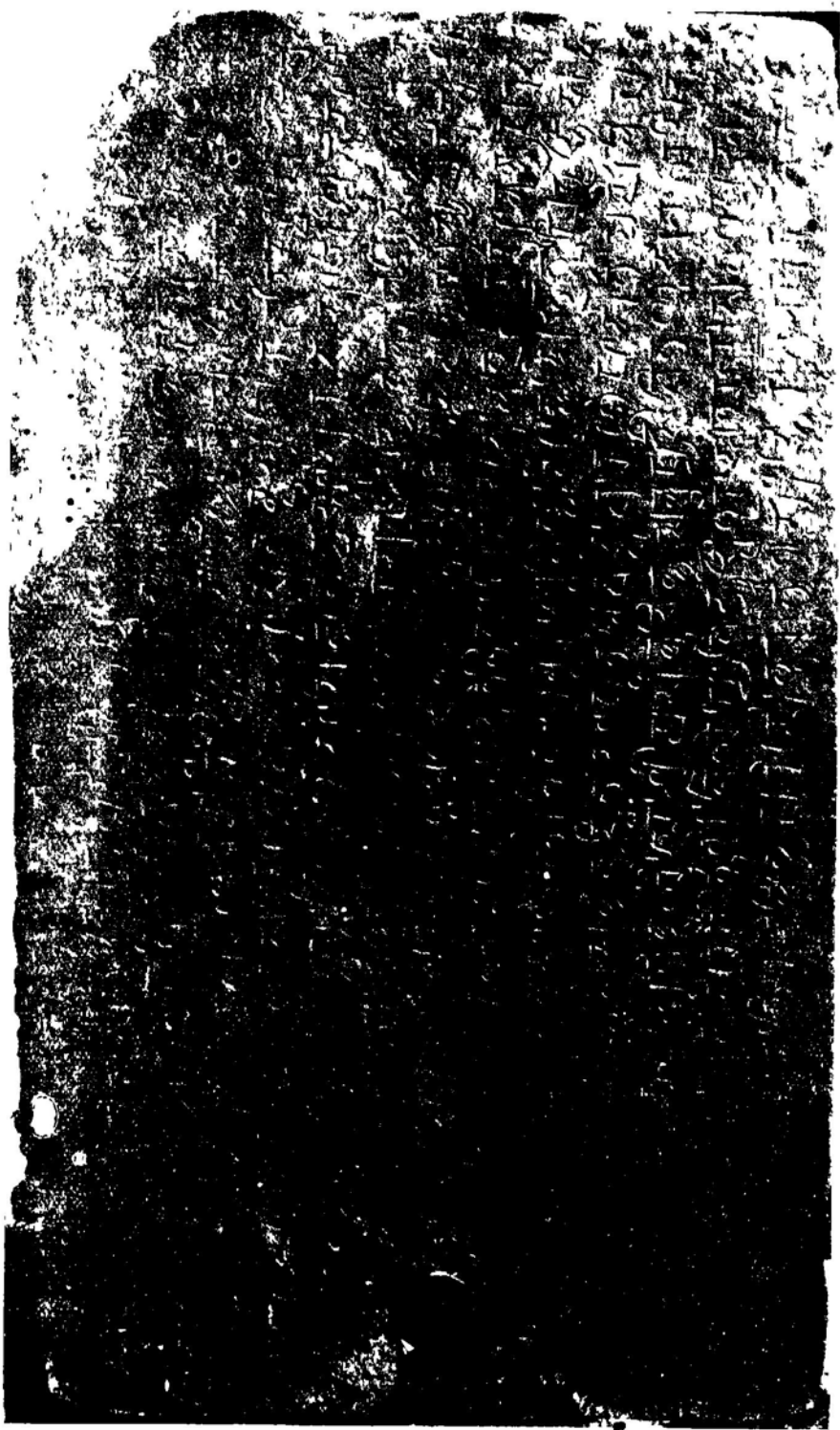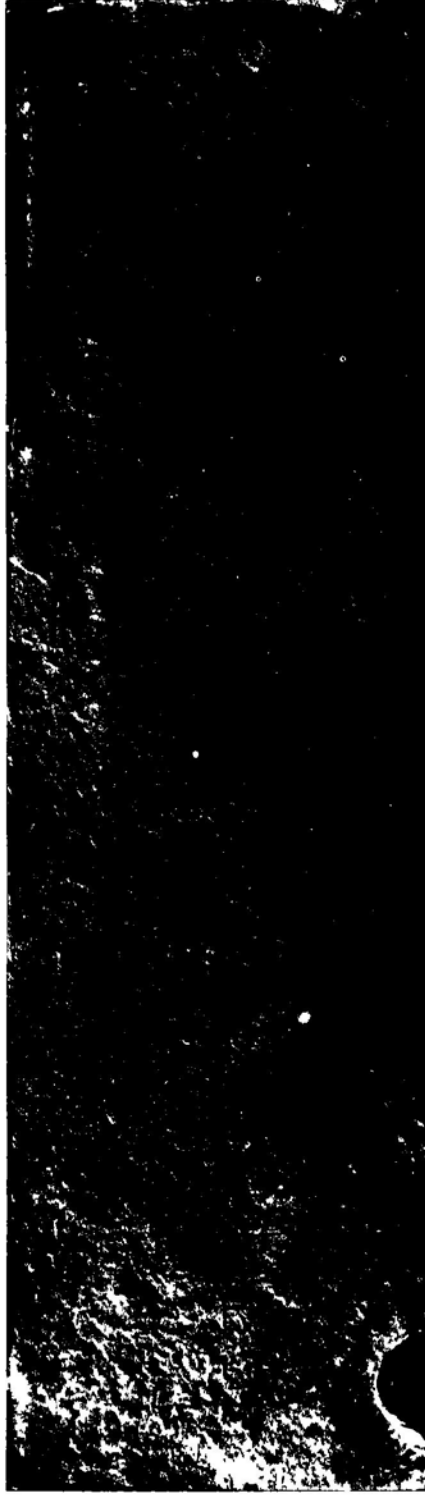
তৃতীয় ফলক—পশ্চাদ্ভাগ।

নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য-শব্দ

১৩১৪ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে মালদহ জেলার গ্রাম্যশব্দ-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া গুটিকতক শব্দ সম্বন্ধে দুইএক কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ঐ শব্দগুলি নদীয়া জেলা ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী জেলাবাসী লোকে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

শব্দ অর্থ

ওক—বমন। এ কথা ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলায়ও প্রচলিত।

কল্প—দুষ্ট। এ কথাটী ২৪ পরগণায়ও ব্যবহৃত হয় "দুষ্ট" অর্থে, "জারজ" অর্থে নয়। প্রয়োগ বোধ হয় কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি।

আতায় কাতায়—যন্ত্রণাতে ছট্‌ফট্‌ করা। ২৪ পরগণা ও নদীয়া দুই জেলায়ই ব্যবহৃত হয়। কাহারও কাহারও মুখে "আতারি কাতারি" এইরূপ প্রয়োগ শুনিতে পাই।

উট্‌কান—"দোষ খুঁজিয়া বাহির করা" অর্থে নাই হউক "খুঁজিয়া বাহির করা" অর্থে ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছি।

উঠানা—রোজ রোজ কোন দোকান হইতে দ্রব্য লওয়া। পূর্ব্বোক্ত দুই জেলায় ইহার ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে ইহা "উঠ্‌লা" উচ্চারণ করে।

আস্‌নাই—প্রণয়। স্ত্রীপুরুষের প্রেম। ২৪ পরগণার কোন কোন লোকের মুখেও শুনিয়াছি।

গেমা ওগো—ওহে। "ওগো" শব্দ ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় খুব প্রচলত।

খোরা—"বড় পাথরের বাটী" এই অর্থে উপরোক্ত দুই জেলাতেই চলিত আছে।

খলিফা—ওস্তাদ, শিল্পনিপুণ, দরজি। এ কথাটা ২৪ পরগণা ও নদীয়া দুই জেলাতেই প্রচলিত আছে।

ঘুস্‌কী—যে স্ত্রীলোক গোপনে পরপুরুষগামিনী হয়। এ কথাটা অন্য অনেক জেলায় চলিত।

ঘাবড়ান—ভয় খাওয়া। নদীয়া জেলায় এবং বোধ হয় ২৪ পরগণায়ও শোনা যায়।

চম্পট—পলায়ন, অদৃশ্য হওয়া। অন্য অনেক জেলায় চলিত।

জবড়জঙ্গ—জড়ভরতের মত কেমন একটা। ২৪ পরগণা ও নদীয়াও চলিত।

জুয়ারি—যাহারা জুয়া খেলে। বোধ হয় নদীয়া জেলায়ও শুনিয়াছি।

ঝুটমুট—"মিথ্যা কথা" অর্থে বোধ হয় ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় শুনিয়াছি।

ছপ্পর—চাল। বেহারে এ কথা চলিত আছে। ঐ দেশের কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছি।

টং—যেমন "রাগিয়া টং হইল"। ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলীতেও ইহা চলিত আছে।

ট্যাঙ্গস—ল্যাঙ্‌ড়াইয়া হাঁটা। ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার আছে।

টিপা—কৃপণ। "টেপা" এই আকারে ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায় ইহার চলন আছে।

দিগ্‌দারি—বিরক্ত করা। এ কথার উপরোক্ত দুই জেলায় চলন আছে।

ধুম্‌সা—বড় মোটা পুরুষ। "ধুম্‌সো" আকারে ইহা উপরোক্ত দুই জেলায় ব্যবহৃত হয়।

ধুম্‌সী—বড মোটা স্ত্রীলোক। ২৪ পরগণা ও নদীয়ার চলিত আছে।

ধাপ্পা—ফাঁকি। উপরোক্ত দুই জেলায় চলিত।

ধুমধড়াক্কা—ধুমধাম। ২৪ পরগণায় এবং বোধ হয় নদীয়ায়ও এ কথা শুনিয়াছি।

বিয়া—স্ত্রীচিহ্ন। উড়িষ্যায় এ কথা চলিত আছে।

ভাতারআউলী—সধবা। ২৪ পরগণায় ইহা শুনিয়াছি।

ফটিকচাঁদ—ফুলবাবু। ২৪ পরগণায় চলিত আছে যথা—"নদের ফটিকচাঁদ"।

ফডাই—একপ্রকার জামা। "ফড়ুই" রূপে কিছুদিন পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার ছিল। এখন আছে কি বলিতে পারিলাম না।

মড়া—মৃত। ২৪ পরগণায় স্ত্রীলোককে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি ইহা প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছি।

মবকা—ভঙ্গপ্রবণ। নদীয়া ও ২৪ পরগণায় "মড়্‌কা" রূপে ইহার ব্যবহার শুনিয়াছি।

পুতথাকী—যে স্ত্রীলোক পুত্রকে খায়। ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় আছে।

খস্তারাম—বলবান্। দীর্ঘাকার ও বলবান্ অর্থে "খস্তরাম" রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণা এবং বোধ হয় নদীয়াতেও শুনিয়াছি।

লিকি—উকুন। "লিকি" রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণায় প্রচলিত।

লগ্যা বা লগি—"লগি" অর্থাৎ লম্বা বাঁশ (নৌকার) শব্দ নদীয়ায় চলিত আছে।

সল্লা—পরামর্শ। নদীয়ায় প্রচলিত আছে। ২৪ পরগণার কথা বলিতে পারিলাম না।

হরবড়—হানি। নদীয়ায় শুনিয়াছি। ২৪ পরগণায়ও বোধ হয় চলিত আছে।

টানের বছর—অন্নকষ্টের বৎসর। বোধ হয় নদীয়ায় এরূপ প্রয়োগ শুনিয়াছি।

বরাত—প্রয়োজন। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায়ও চলিত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শূন্যপুরাণ

১। শূন্যপুরাণের সম্পাদকের অনুমানে পুরাণখানির লেখক, লেখকের নিবাস ও সময়।

১৩১৪ সালে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পুরাবিৎ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা বাঙ্গালা শূন্য-পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মুখবন্ধে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, ঐ পুরাণ বাঙ্গালাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ। গ্রন্থের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। তিনি গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ে ছিলেন, এবং এই রাজা খৃঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। সে আজি নয়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

কিন্তু সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, কালে পুরাণখানির নূতন সংস্করণ হইয়াছিল। তথাপি কোন কোন অংশের বয়স নাকি ছয় সাত বৎসর!

এই অনুমান সত্য হইলে শূন্যপুরাণখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইবে। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় এত পুরানা পুস্তক আর পাওয়া যায় নাই। এরূপ গ্রন্থের একটু বিস্তারিত আলোচনা কর্ত্তব্য।

মুখবন্ধ হইতে জানিতেছি, বাঁকুড়া জেলা হইতে ছাপা গ্রন্থের আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছিল। আদর্শপুথীতে গ্রন্থ সমাপ্তিকাল লিখিত ছিল না। প্রবীণ সম্পাদক পুথীর অক্ষর বিন্যাস ও অবস্থা দৃষ্টে উহাকে প্রায় তিনশ বছরের পুরানা মনে করিয়াছেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটী'তে দুইখানি খণ্ডিত পুথী আছে। বাঁকুড়া জেলার পুথী পুরাতন বলিয়া সম্পাদক-মহাশয় সেই পুথীকে আদর্শ করিয়াছেন। আদর্শে ছিল না, এমন কতক অংশ 'সোসাইটি'র পুথী হইতে লইয়া ছাপা শূন্যপুরাণে প্রবিষ্ট করিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা পুথী মাত্রই বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষার সহায় হইতে পারে। কিন্তু যদি পুথীর রচনাকাল এবং রচকের নিবাস জানা না থাকে, তাহা হইলে সে পুথীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। শূন্যপুরাণখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বহু ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই, স্থান সম্বন্ধেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। বলা বাহুল্য, বাঁকুড়ায় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শূন্যপুরাণের ভাষা বাঁকুড়ার, এ কথা বলিতে পারা যায় না। রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে বলিয়া শূন্যপুরাণখানি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিকার রামাই পণ্ডিতের লেখা, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। নগেন্দ্রবাবুও লিখিয়াছেন, 'শূন্যপুরাণের পুথিখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে ক্রমেই কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে। · ...... বলিতে কি স্থানে স্থানে এরূপ পাঠবিকৃতি দাঁড়াইয়াছে যে কোন্‌খানি আদর্শ ও কোন্ খানি নকল তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব।' পুনশ্চ লিখিয়াছেন, 'ঘনরাম, সীতারাম প্রভৃতি ধর্ম্ম-মঙ্গলকারগণ যে দাতর-বাটা ও সন্ন্যাসী-কাটার উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য শূন্যপুরাণ মধ্যে

সে অংশ পাইলাম না। মহামহোপাধ্যায় [শ্রীহরপ্রসাদ] শাস্ত্রী মহাশয় রামাই পণ্ডিতের রচিত যে ধ্যানের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও তিনখানি পুথিতেই পাওয়া গেল না।'

তথাপি শূন্যপুরাণখানিকে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিকার রামাই পণ্ডিতের বলিবার হেতু কি? বোধ হয়, দুই হেতু,—(১) গ্রন্থখানির মূল প্রাচীন বোধ হয়, এবং (২) রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে। এই দুই হেতু তেমন বলবান্ নহে।

২। গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন অনুমান।

ছাপা শূন্যপুরাণখানি পড়িয়া মনে হইয়াছে,—

(১) উহা শ্বেতনীলাদি চারি বা পাঁচ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপণ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের লেখা নহে।

(২) উহা একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ দুখানি মঙ্গলের বা গানের পুথীর সংগ্রহ।

(৩) উহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত।

(৪) উহার সমুদায়টা বাঁকুড়া জেলার লোকের লেখা নহে।

(৫) উহা পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা উপস্থিত লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু শূন্যপুরাণখানির দেশ কাল পাত্র নিরূপিত না হইলে উহা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া থাকিবে, ভাষা শিক্ষার সহায় হইবে না, এই হেতু উপরি লিখিত অনুমানগুলি পরিষৎ সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতেছে।

৩। শূন্যপুরাণখানি গান; পূজাপদ্ধতি নহে।

ছাপা শূন্যপুরাণে ১৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার দুই চারি পৃষ্ঠা গদ্য, অবশিষ্ট পদ্য। পদ্যের মধ্যে ১৭টি ত্রিপদী, অপর সমস্ত পয়ার। সকল কবিতার শেষে রামাই পণ্ডিতের নাম আছে। যথা,—

১১ পৃঃ সুনিআ ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত।

১৮ „ গাইল রামাই পণ্ডিত সুন সর্ব্বজন।

৩২ „ পাবন গীত পণ্ডিতরামে গান।

 ত নাএকে ধর্ম্ম চিন্তি জে (চিন্তির ?) কল্যাণ॥

৪০ „ তে রামাই রচিলঁ পাঁচালী সঙ্গীত।

দুইটি কবিতার মাথায় রাগেরও উল্লেখ আছে। ভণিতায় নায়কের কল্যাণ প্রার্থনা আছে। যিনি ধর্ম্মের গান করান, গায়কেরা তাঁহাকে নায়ক বলেন। ধর্ম্মের কিংবা শিবের গাজনের পর সন্ন্যাসীরা গান গাইয়া নায়কের মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে কথনও স্মরণ করা যাইতে পারে।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৪ সালের) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল' নামক প্রবন্ধে ধর্ম্মমঙ্গলের বারমতি শব্দের মূল অনুসন্ধান করিয়াও করেন

নাই। তাঁহার কথায় জানিতেছি, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে শব্দটি বার্ম্মতি এবং দুই এক স্থলে ব্রহ্মতি রূপ পাইয়াছে। 'এতক্ষণে ধর্ম্মের বাম্মতি হইল সায়।'—ইহার অর্থে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'এতক্ষণে ধর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা সফল হইল।' কিন্তু ব্রহ্মতি শব্দের মূল কি? মূল না পাইলে অর্থে সন্দেহ থাকে। ব্রহ্মতি—ব্রহ্ম স্তুতি?

শূন্যপুরাণে বার্ম্মতি ব্রহ্মতি শব্দ নাই, আছে বারমতি। যথা,—

৭ পৃঃ,　　ধর্ম্মপদরাজে মধুলুব্ধ বারমতি।
　　শ্রীযুত রামাই গাএ মধুর ভাবতী॥
　　(বারমতি মধুতে লুব্ধ রামাই গান করে।)

৩৪ পৃঃ,　　দেখ ঘর দানপতি সুপ্রসন্ন বারমতি।
　　ধনবংস মঙ্গল করএ যুগপতি॥

(হে দানপতি রাজা হরিচন্দ্র) ধর্ম্মরাজের ঘর দেখ, বারমতিতে সুপ্রসন্ন যুগপতি ধনবংশ করেন।)

৭৮ পৃঃ,　　ভাবি যুগেশ্বর চলিলা মুনিবর সুনিআ বারমতি ভরন॥

(নারদ মুনিবর যুগেশ্বর করিয়া এবং বারমতি ভরন (পূরন ?) শুনিয়া চলিলেন।)

৯৯ পৃঃ,　　মনে আনন্দিত বারমতি গীত পুরিল ঘর।

(সকলে মনে আনন্দিত হইলেন, বারমতি গীতে ঘর পূর্ণ করিল।)

১৩৮ পৃঃ,　　বারমতি করে রামাই লয়্যা দিজগণ।

(দ্বিজগণ লইয়া রামাই বারমতি করে।)

শব্দটি বার্‌মতি হইলে ছন্দে মিলিবে না, বারমতি পড়িতে হইবে। বারমতি ক্রমে বার্‌মতি—বার্ম্মতি—এবং কোন্ পণ্ডিতের দ্বারা ব্রহ্মতি না হইতে পারে এমন নয়। আমার স্মরণ হইতেছে আমি ধর্ম্মের পণ্ডিতের মুখে বারমতি শুনিয়াছি, বার্‌মতি শুনি নাই। বারমতি পূজা—দ্বাদশ বিধ পূজা, বারমতি গীত—দ্বাদশবিধ পূজার গীত॥ মতি, ওড়িয়া—মন্তি, মতি—প্রকার। বাঙ্গালা যেমত, এমত শব্দেও সেই মতি, মত। বারমতি—যথা, টীকাপাবন, ফুলপাবন, অর্ঘপাবন, পঞ্চদেবতাপূজা, স্নান, মনুই, সন্ধ্যা, চনাপাবন, ইত্যাদি।

এই সকল ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি। শাস্ত্রী মহাশয় ধ্যানের যে মন্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন, সে মন্ত্রে শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনের ছায়া দেখিতে পাই। কিন্তু শেষের পদ, 'ধর্ম্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রামাই গান'—হইতে বুঝিতেছি 'সৃষ্টিপত্তন'ও ধর্ম্মমঙ্গলের অংশ।

অতএব জানিতেছি, (১) শূন্যপুরাণের অধিকাংশ গান বা ধর্ম্মমঙ্গল, (২) রামাই পণ্ডিত গানের রচক, এবং (৩) তিনি অন্যের নিকট 'ভাবতী শুনিয়া' গান রচিয়াছিলেন। গানকে পূজাপদ্ধতি বলা যায় না। পূজাপদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার আশা করা যায়। ১৩১১ সালের সাঃ পঃ পত্রিকায় রামাই পণ্ডিত ও যাত্রাসিদ্ধির বিবরণ দেখুন। উহা গদ্য, প্রায়ই সংস্কৃত, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পদ থাকিলেও সমস্তটা বাঙ্গলা নহে।

আলোচ্য গ্রন্থের দুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৬২ পৃষ্ঠে 'অথ বারমতিপূজার পদ্ধতি লিখ্যতে।' কিন্তু যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পদ্ধতি নহে, বেড়া মনুইর পালা! ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই টুকু পদ্ধতি।

৪। শূন্যপুরাণের শব্দ ও শব্দের বানান।

শব্দ দেখিলে শূন্যপুরাণ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের রচনা মনে হয়। ছিস্‌টি, ভূমিস্‌টি, বস্তা, বাস্তন, তপসী, পৈরাগ, তপিস্‌সা, বিছ্‌রাম (বিশ্রাম), ত্রিপিনী (ত্রিবেণী), একত্তব, মিত্তিকা, পচ্চিম, গড়ুর (গরুড়), মোউর (ময়ূর), লাএক (নায়ক), পান (প্রাণ), ছাওযা (ছায়া), চান (স্নান), নিল্লঅ (নির্ণয়), ইত্যাদিতে রাঢ়ের গ্রাম্য নিরক্ষর লোকের শব্দ অবিকল পাই। মূলে কি ছিল কে জানে; এখন যাহা আছে, তাহা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের লেখা। শূন্য-পুরাণের সম্পাদক মহাশয় এই কারণেই বোধ হয় অনেক শব্দের ঠিক অর্থ কিম্বা কোন অর্থ করিতে পারেন নাই।

প্রায়ই নিম্নবর্ণের গায়কেরা ধর্ম্মের গান গাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান লেখকের ভাগ্যে ধর্ম্মের গান শোনার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের ভাষা দেখিলে বোঝা যায়, গ্রাম্য নিরক্ষর লোকে সে মঙ্গলের পালা লিখিয়াছিল। এরূপ স্থলে শব্দের বানান দেখিয়া গ্রন্থরচনার কাল নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'এক সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, রামাই পণ্ডিতের এই গ্রন্থখানি যখন ধর্ম্মপণ্ডিতগণের নিকট বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য, তখন এই গ্রন্থের ভাষার উপর লেখনী ধারণ করিতে হয়ত কেহ সাহসী হন নাই। কিন্তু এখন নানা স্থানের তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইতে গিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিন পুথির উপরই তিনটী জয়গোপালের ছায়া পড়িয়াছে।'

আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় শূন্যপুরাণখানিকে পূজার পদ্ধতি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। পুরাণ নামেও জানিতেছি, উহা 'বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য' নহে। বাস্তবিক উহা গানের পালা। গানের পালা যেমন গায়ন-সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে তাহার ভাষার ও বানানের তেমন রূপান্তর ঘটে। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালাভাষার অতি প্রাচীন পুথিগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেকটা প্রাকৃতরূপ ধারণ করিত, যেমন সংস্কৃত য স্থানে প্রাকৃতে জ, শ ও ষ স্থানে স ইত্যাদি। আদর্শ পুথিতে অনেকটা সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। * * * এই পুথির বিশেষত্ব এই ণ, য, ষ এবং শ এই কয়েকটী বর্ণের তেমন প্রয়োগ নাই।'

আজকালকার গ্রাম্য লিপিকরের বানানেও ণ নাই; য জ, শ ষ স, একের পরিবর্ত্তে কলমের মুখে যেটা আসে সেটাই দেখিতে পাই। সংস্কৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের সময়ে বর্ণের উচ্চারণ ঠিক ছিল। এখন ন ণকারের একরূপ উচ্চারণ, য জকারের একরূপ, শ ষ স-কারের একরূপ

উচ্চারণ হওয়াতে লেখকের অভিরুচি অনুসারে কোন একটা দ্বারা শব্দ বানান হইয়া থাকে। এক এক লেখকের এক এক বর্ণের দিকে ঝোঁক থাকে। ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় যে 'সূর্য্যের পাঁচালী' ছাপা হইয়াছে, তাহা ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে লেখা। তাহাতে দেখিতেছি, ষ স স্থানে শ, এবং য স্থানে জ আছে। ঐ সালের পত্রিকায় 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' প্রসঙ্গে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ণকার স্থানে সর্ব্বত্র নকারের প্রয়োগ এবং যকার স্থানে সর্ব্বত্র জকারের প্রয়োগ, ও শকার স্থানে সর্ব্বত্র সকার প্রয়োগ; যাঁহারা প্রাচীন রীতি বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি আমি তাহা জানি না, কিন্তু কোন পুথিতে তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই না।' এই কথাই ঠিক বোধ হয়। কারণ আজকাল আমরা শব্দের কৃত্রিম বানানে যতটা বাঁধা পড়িয়াছি, প্রাচীনেরা ততটা পড়েন নাই। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, হাতের লেখা পুথি পড়িয়া এবং ধ্বনি শুনিয়া লেখককে শব্দের বানান করিতে হইত। যাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা শব্দ কিরূপ বানান করিতেন, ইহা জানিতে না পারিলে সেকালের বানানের রীতি ধরা পড়িবে না। অশিক্ষিত গ্রাম্য লিপিকরের বানানকে বাঙ্গালা শব্দের বানান মনে করিলে আজকাল্‌কার আদালতের মুহুরীকে বাঙ্গালা-ভাষার লেখক স্বীকার করিতে হইবে।

৫। বর্ত্তমান শূন্যপুরাণের সময় এবং লেখক।

তথাপি শূন্যপুরাণের শব্দের বানান প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছে। একটি বানান বিশেষ দ্রষ্টব্য। মাআবর, দিআন, নারাঅন, এবং দিআ, লইআ, করিআ ইত্যাদিতে প্রায় সর্ব্বত্র 'অ আ' দেখিতেছি। আজকাল আমরা একটা নূতন স্বরবর্ণ আবিষ্কার করিয়াছি। 'য়' টাকে আমরা হলন্ত "অ" করিয়া ফেলিয়াছি। অ আ ই উ এ ও স্থানে য় য়া য়ি য়ু য়ে য়ো লিখিতেছি। এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা অল্পকালে ঘটিতে পারে নাই। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে য় য়া লিখিয়াছিলেন। সেই সময়ের মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণেও য় য়া পাই। কৃষ্ণদাস ও কবিকঙ্কণ উভয়েই সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। শূন্যপুরাণেও দুই এক স্থানে য়া আছে। ওড়িয়াভাষায় য়-কার হলন্ত অ হয় নাই। এখানে আর এক প্রশ্ন মনে আসে। বাঙ্গালাভাষায় অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ কতকাল হইতে হলন্ত উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে? শূন্যপুরাণে হঅ, জঅ, জঅকার আছে। কোন কোন স্থান পড়িলে মনে হয়, সেকালে হঅ, জঅ, এইরূপই উচ্চারিত হইত। (অবশ্য) জয় শব্দের জঅ উচ্চারণ একবারে ভুল।) শূন্যপুরাণের নিম্নের কবিতাটি যতি দিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলে ঐ অনুমানে আসিতে হইবে।

"মঙ্গলরাগ—

চৌদিকে জঅজঅ আনন্দেত পূরল
কৌতুকেত বাজএ বাজনা।

পণ্ডিত বাম্ভন বেদনিনাদন
জালিয়া ধূপ দীপ ধুনা ॥"

কিন্তু গানের সুর লক্ষ্য করিয়া ভাষার শব্দের উচ্চারণ অনুমান করা চলে না। ১৩১৫ সালের সাঃ পঃ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের কএকটি চতুর্দ্দশ পদাবলী ছাপা হইয়াছে। পদাবলীর *'লেখক শ্রীগণেশরাম শর্ম্মণঃ সাং কুতুলপুর' (বাঁকুড়া জেলা)। পদগুলি তিন শত* বৎসরের পুরাণা পুথিতে ছিল। অতএব লিপিকর, লিপিকরের বাসস্থান এবং সময়, তিনটি বিষয়ই জানা গিয়াছে। এই পদাবলীতে দেখিতেছি, অভিনঅ হঅ খতিসঅ শ্রবন হরস সসী জার জদি জাএ ইত্যাদি আছে। সংস্কৃত শব্দের বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া মনে হয় 'শর্ম্মা' হইলেও লিপিকর লেখাপড়া জানিতেন না। অতএব শূন্যপুরাণের বানানের সহিত এই পদাবলীর বানান তুলনা করিতে পারা যায়, এবং পুরাণখানিকে অন্ততঃ তিন শত বৎসরের পুরাণা বলিতে পারা যায়। নগেন্দ্রবাবুও পুথির বয়স অত মনে করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শূন্যপুরাণের উত্তরসীমা এক রকম পাইলাম, পূর্ব্বসীমা কি? নগেন্দ্রবাবু রামাই পণ্ডিতকে প্রায় নয়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। আমাদের সন্দেহ এই যে, তিনি যে রামাইর সময় দিয়াছেন, শূন্যপুরাণের গায়ক রামাইর কি বোধ হয় না সেই সময়? এই দুই রামাই এক প্রমাণ, (১) শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনে লিখিত আছে, এক সময়ে রেখা রূপ বর্ণ চিহ্ন রবিশশী রাতিদিন জলস্থল পাহাড় পর্ব্বত স্থাবর জঙ্গম ঠাকুরের দেউল দেহারা পৈরাগের মাধব, ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তখন 'দেবস্থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ।' দেবস্থল ছিল না, জগন্নাথ ছিলেন না। এই উক্তি হইতে বুঝিতেছি, বঙ্গদেশে জগন্নাথদেব প্রসিদ্ধ হইবার পর 'সৃষ্টিপত্তন লেখা হইয়াছিল। *কোন্ সময়ে জগন্নাথদেব বঙ্গদেশের লোকের নিকট খ্যাত হইয়াছিলেন? পুরাবিৎ নগেন্দ্রবাবু* ইহার উত্তর দিতে পারেন। পুরীর বর্ত্তমান মন্দির খৃঃ ১২ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও জগন্নাথ দেব ছিলেন; কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশান্তরে তাঁহার খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পুরীর মন্দিরের 'মাদলা পাঁজী' ঐ সময়ের পরের আছে, পূর্ব্বের নাই। ইহাতেও বোধ হয় বর্ত্তমান মন্দিরনির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ দেবের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, সন্দেহ দাঁড়াইতেছে এবং বোধ হইতেছে শূন্যপুরাণের যে টুকুও নয় শত বর্ষ পূর্ব্বের রামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। বলা বাহুল্য, বেদব্যাস যে কালেই থাকুন তাঁহার নাম দিয়া আজিও পুরাণ রচিত হইতে পারে। (২) শূন্য-পুরাণ পড়িলে বেদব্যাসের কথা মনে পড়ে। বুড়া ব্যাস কখন ছিলেন, কে জানে। হয়ত তিনি দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ছিলেন। যদি তাই হয়, সেই ব্যাস যখন পুরাণ লিখিতেছেন, তখন আপনাকে হরির এক প্রাচীন অবতার বলিয়া জানাইলে সন্দেহ জন্মে। (শ্রীমদ্‌ভাগবত দেখুন)। শূন্যপুরাণেও দেখিতেছি, পূর্ব্বকালে চারিজন, কোথাও দেখিতেছি, পাঁচজন পণ্ডিত ছিলেন। সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিত, ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিত, দ্বাপরযুগে

কংসাই পণ্ডিত, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, এবং আর এক পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার নাম গোঁসাই পণ্ডিত। গোঁসাই পণ্ডিত কোন্ যুগে ছিলেন, তাহা লিখিত নাই।*

পরে দেখাইতেছি, শূন্যপুরাণ একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ ছয়খানি পুথীর সংগ্রহ। বক্তব্যের সুবিধার নিমিত্ত 'সৃষ্টিপত্তন' ব্যতীত শূন্যপুরাণের অবশিষ্ট অংশকে ক খ গ ঘ ঙ চ এই ছয় পুথীতে বিভক্ত করিবার কল্পনা করিতেছি। মোটামোটি, ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৪২ পৃষ্ঠা ক-পুথী, ৪৩ হইতে ৮১ পৃঃ খ-পুথি, ৮১—৯৮ পৃঃ গ-পুথি, ৯৮—১১৯ পৃঃ ঘ-পুথি, ১১৯—১৩২ পৃঃ ঙ-পুথি, ১৩২—১৪২ পৃঃ (শেষ) চ-পুথি। এই চ-পুথির সমস্তটা 'সোসাইটির' পুথিতে ছিল, আদর্শে ছিল না।

সকল পুথিতে গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ নাই, কএকখানিতে আছে। যথা,—

ক-পুথিতে (৪০ পৃঃ)

"উল্লুক মুক্ত কৈল পঞ্চম দুআর।"

এই ইঙ্গিত মাত্র আছে। ধর্ম্মমণ্ডপের চারি দ্বার শ্বেতনীলাদি চারি পণ্ডিত লইয়াছিলেন। এই হেতু গোঁসাই পণ্ডিতের নিমিত্ত এক নূতন দ্বার—শূন্য বা পঞ্চম দ্বার কল্পনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ঘটদাসী অভআ, কোটাল উল্লুক এবং গতি অনেক ছিল।

খ-পুথিতে (৪৭ পৃঃ)

"পঞ্চম দুআরে কে পণ্ডিত গোঁসাই সে
আইল অনেক গতি লইএ বসি।

---

* শ্বেতাই, নীলাই ও কংসাই পণ্ডিত কাল্পনিক বোধ হয়। শূন্যপুরাণে পাই, সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিতের শ্বেতবর্ণ ঘোড়া, শ্বেতবর্ণ যোড়া, শ্বেতবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের পশ্চিম দ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী বসুআ (বসুধা), কোটাল চন্দ্র, গতি বা অনুচর শিষ্য চারি শ ছিল। ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিতের নীলবর্ণ ঘোড়া, নীলবর্ণ জোড়া, এবং নীলবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের দক্ষিণদ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী চরিত্রা, কোটাল হনুমান, এবং গতি আটশ ছিল। দ্বাপরযুগে কংসাই (কাংস) পণ্ডিতের কাংসবর্ণ ঘোড়া, কাংসবর্ণ জোড়া, এবং কাংসবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী গঙ্গা, কোটাল সূর্য্য, গতি বার শ ছিল। কলিযুগে রমাই পণ্ডিতের তাম্রবর্ণ ঘোড়া, তাম্রবর্ণ জোড়া, এবং তাম্রবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের উত্তর দ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী দুর্গা, কোটাল গরুড়, গতি ষোল শ ছিল। গোঁসাই পণ্ডিত শূন্য বা পঞ্চম দ্বারের পূজক ছিলেন। তাঁহার ঘটদাসী অভআ (অভয়া), কোটাল উল্লুক এবং 'অনেক' গতি ছিল।

শ্বেতাই নীলাই কংসাই এই তিন পণ্ডিতের নাম তবে শ্বেত নীল কাংসবর্ণ (পীতবর্ণ?) বেশভূষা হইতে আসিয়াছিল। চারি যুগ, চারি বর্ণ। শ্বেত নীল পীত রক্ত এই চারিবর্ণ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ক্রম অন্য প্রকার, শ্বেত রক্ত পীত নীল—চারি যুগের এই চারি বর্ণ হইবার কথা। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার পরে গোঁসাই পণ্ডিত আসিয়াছিলেন।

উল্লুক কোটাল কোলে বস্তা আছে পাঠশালে
আমনি অভআ ঘটদাসী ॥"

এইরূপ আরও তিন স্থানে (৪৩, ৪৭, ৫৪ পৃঃ) আছে।

গ-পুথিতে (৬১ পৃঃ)

"পঞ্চম দুআরে গোঁসাঞি জার আছে অনেক গতি।"

এইরূপ আর দুই স্থানে (৬৬, ৭৫ পৃঃ) উল্লেখ আছে। অন্য পুথি গুলিতে গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ পাই না। এই গোঁসাই পণ্ডিত কে ছিলেন? নগেন্দ্রবাবুর মুখবন্ধে দেখিতেছি, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে,—

"তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন॥"

গোঁসাই পণ্ডিত যিনিই হউন, তিনি রামাই পণ্ডিত ছিলেন না। উভয়ে এক হইলে শূন্যপুরাণের উক্তি মিথ্যা হয়। হয়ত দুই পণ্ডিতেই ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোঁসাই নাম হইতে সন্দেহ হয়, তিনি হয়ত প্রথমে বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন, হয়ত সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম গোঁসাই না হইতে পারে। যাহাই হউক, গোঁসাই শব্দ হইতে চৈতন্যদেবের পরের লোক মনে হয় না কি?

আরও দেখা যাইতেছে, যে রামাই শূন্যপুরাণ রচিয়াছিলেন, ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বার বিশেষের (উত্তর দ্বার বা গাজন দুআরের) পণ্ডিত হইবার তাঁহার সম্ভাবনা ছিল না। লেখক আপনাকে পৌরাণিক কল্পনা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতেই ধরা পড়েন, তিনি হয় পৌরাণিক নহেন, কিম্বা পুরাণের লেখক নহেন। কত কাল গেলে লোকে পৌরাণিক হইয়া পড়িতে পারেন? যদি নগেন্দ্রবাবুর ইতিহাসের রামাই খৃঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন, তাহা হইলে শূন্যপুরাণ ঐ সময়ের অনেক (দুই শত বৎসর?) পরে রচিত। (৩) উপরে খ ও গ-পুথিতে পঞ্চম পণ্ডিত গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ পাইয়াছি। ক-পুথিতে ইঙ্গিতমাত্র আছে। এই পদটিকে পরে যোজিত মনে করিতে বাধা নাই। কিন্তু খ ও গ-পুথিতে সেরূপ মনে করিতে পারি না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ দুই পুথির ভাষার শব্দ দেখিলেও খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর পরে আসিতে হয়। সমুদয় শূন্যপুরাণের মধ্যে শেষের কবিতাটিতে (আমাদের গণনায় চ-পুথিতে) ধর্ম্মঠাকুর নিজেই 'যবনরূপী' হইয়াছেন। এখানে যাবনিক শব্দ আছে। অন্যত্র খ-পুথিতে—

(৪৭ পৃঃ) দোকানি পাতিআ গেল হাট।
(৪৯ পৃঃ) (হিন্দুর ভুত নগরে সেন্ধাঅ)॥
কোমরেত তোপ দিল পাএত ডাড়ুকা।

গ-পুথিতে—

(৭৮ পৃঃ)　　চলিল তত্তঃপর মুনি বরাবর
　　　　　　কহিল দেবর ভারতী ॥

ঙ-পুথিতে—

(১০৫)　　মাল ভাণ্ডার রইঘর।

(১২৩)　　ধম্মর বাজার মাঝে।

দোকানি, হিন্দু, কোমর, তোপ (?), বরাবর, মাল, বাজার—এই কএক শব্দ স্পষ্ট যাবনিক। তোপ শব্দটি তোক হইবার সম্ভাবনা। যাবনিক তৌক—শৃঙ্খল।* কেহ কেহ তোপ শব্দে কামান বুঝিয়াছেন। কিন্তু কোমরে কামান (এবং পাএ বেড়ী) হইতে পারে না। যাহা হউক, বঙ্গের ইতিহাসে পাই, খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর আরম্ভে বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাঢ় অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ের পূর্ব্বে অতগুলি যাবনিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং কিছুকাল না গেলে কোমর শব্দের মতন শব্দ সেকালে প্রচলিত দেশী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিত না। শব্দগুলি এমন কবিতায় আছে যে, সে গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। অতএব ছাপা শূন্যপুরাণের খ গ ঙ এবং চ পুথী খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর পরে রচিত।

উপরের তিন পুরাণ হইতে শূন্যপুরাণের রচনাকালের পূর্ব্বসীমা খৃঃ ১৩শ শতাব্দী পাই।

৬। শূন্যপুরাণ সংহিতাগ্রন্থ।

শূন্যপুরাণের সমস্তটা প্রাচীন নহে, কিম্বা সমস্তটা একখানি গ্রন্থ নহে, গ্রন্থের বিষয় দেখিয়া বুঝিতেছি একখানি গ্রন্থ নহে। লিপিকর যেখানে যা পাইয়াছে, তাহাই প্রায় পরে পরে জুড়িয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'শূন্যপুরাণের রচনা বহুস্থলেই পুনরুক্তি দোষ-দূষিত।' পুনরুক্তির দুই কারণ পাওয়া যায়। (এক) এখানি পদ্ধতি নহে, ধর্ম্মমঙ্গল গানের পুস্তক; (দুই) ভিন্ন ভিন্ন পুথী একত্র হইয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। গানের পালার ধারাই এই যে, তাহাতে একই বিষয় লইয়া অনেক গান থাকে। প্রমাণ, 'বঙ্গবাসী ছাপাখানা' হইতে প্রচারিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। সেখানির সমস্তটা যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচিত নহে, পুনরুক্তিই তাহার প্রমাণ। গায়নেরা নিজে গান রচনা করিয়া পালা লম্বা করেন, কলাবত্তাও প্রকাশ করেন, এবং অন্যের রচিত ভাল গান পাইলে নিজের পুথীর মধ্যে পুরিয়া ফেলেন।

---

* মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গলে—

　　"হাতে গলে দিল তোক পায় দিল বেড়ী।"

তাড়ুকা শব্দটি খনার পুরাতন বচনে আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'দাঁড়ুকা সহিত তুমি কাঁহা বহি গেল।' এই শব্দটি কি দণ্ডিকা দণ্ড অরূপ বেড়ী শব্দের অপভ্রংশ? সংস্কৃত দণ্ডুকা শব্দ এই অর্থে আছে কি?

ইহাতে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের এত সংস্করণ হইয়াছে। সেদিন কোন কথকঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবোপাখ্যান কথকতা করিতে বসিয়া উত্তানপাদ রাজাকে দিয়া সুনীতি রাণীকে বনবাসে পাঠাইলেন। তখন ধ্রুবের জন্ম হয় নাই। কথকঠাকুর আগাগোড়া করুণরস ঢালিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই।

এখন শূন্যপুরাণের বিষয় দেখি। প্রথমে সৃষ্টিপত্তন। এই অংশ একবার বই দুইবার নাই। এই সৃষ্টিবৃত্তান্ত কৌতুকাবহ, কিন্তু উপস্থিত প্রসঙ্গে আবশ্যক নাই। শেষ কথা, ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি, বিষ্ণুকে পালন এবং ত্রিলোচনকে সংহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। আদ্যাশক্তি যোনিরূপা হইয়া সর্ব্বজীবে থাকিবেন। এইরূপে,

'চারিজনায় ছিস্‌টির ভার দিলা পরাৎপর।'

এবং 'সৃষ্টিপত্তন সমাপ্ত।'

ইহার পরে ক-পুথী আরম্ভ। এই হেতু প্রথমে 'শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ' দেখিতেছি। সৃষ্টি-পত্তনের গোড়ায় একবার 'শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ' পাইয়াছি। এখানে আবার পাইতেছি। ইহাতে বোধ হয়, সৃষ্টিপত্তন এবং পরের অংশ দুই পৃথক্ পুথী।

নমস্ক্রিয়ার পর পুথী আরম্ভ। প্রথমে ধর্ম্মঠাকুরের স্নান। এই নিমিত্ত ঘটদাসী কোটাল ও গতি লইয়া চারিদিকের চারি পণ্ডিত আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে স্নান করাইয়া সিংহা-সনে বসাইলেন। এখন তিলক নিমিত্ত ঠাকুরের যোল শ আমিনী (ধর্ম্ম-কামিনী) চন্দন ঘষিলেন। পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন হইল। ঘটদাসীরা গঙ্গাজল দিয়া পুষ্প প্রক্ষালন করিয়া হার গাঁথিলেন। 'আগে গণেশের পূজা দিয়া ফুল জল। তবে সে পূজিব প্রভু ভকত বৎসল॥" ঠাকুরের পূজা হইল। দানপতি রাজা হরিচন্দ্র তাঁহার মদনানাম্নী পাটরাণী ও একশত অপর রাণী এবং বহু কুটুম্ব ব্রান্ধব, বাদ্যভাণ্ড লইয়া ঠাকুরপূজা দিতে আসিলেন। রাণীর পুত্রবর আকাঙ্ক্ষা। মণ্ডপের চারিদ্বার উন্মোচিত হইল, রাজারাণী চারি দ্বারে প্রণাম করিলেন। রাজা-রাণী আসিয়াছেন, ঘটা হইয়াছে। যত দেবতা স্ব স্ব বাহনে পূজা দেখিতে আসিলেন। (কবি রাজার ধর্ম্মঠাকুরের ঘরদেখা একবার পয়ারে বলিয়া আবার ত্রিপদী ধরিয়াছেন। গান বলিয়া দুইবার ? ত্রিপদীটি প্রক্ষিপ্ত ?)। ধর্ম্মের পণ্ডিত রাজা-রাণীকে ঠাকুর দেখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, এই দেখ কূর্ম্মরাজকে (ধর্ম্মঠাকুরকে) নাগরাজ বেষ্টন করিয়াছেন; এই দেখ ধর্ম্মের যোলশ গতি। এই দেখ, পশ্চিমে শ্বেতপণ্ডিত, চন্দ্র কোটাল, বসুয়া ঘটদাসী, চারি শ গতি। এই দেখ দক্ষিণে, ইত্যাদি। রাজা-রাণীর আগমনে বেসাতিরা হাট বসাই-য়াছে। তাহারাও দেখিবে, আবার দ্বার মোচন হইল। ঠাকুর দেখা হইল, কবি বলিতেছেন, 'দুয়ার মুকুত হইল বরত হৈল সায়।' কিন্তু আরও দুইটি কাজ আছে। (বোধ হয়) সকল যাত্রীকে শান্তিবারির তুল্য শুভচূর্ণ (চনাপাবন) দেওয়া হইল, এবং ধর্ম্মঠাকুরের ব্রতকথা শুনান হইল।

আমাদের অনুমানে এইখানে ক-পুথী সমাপ্ত। কারণ পূজার আর কিছু অবশিষ্ট রহিল

না। যাঁহারা গ্রামে ঠাকুর-মণ্ডপে কখনও পূজা দিতে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন উপরি লিখিত বিবরণ পূজা দিবার অবিকল অভিনয়। এইভাবে দেখিলে ক খ গ ইত্যাদি পুথী-গুলিকে পূজার পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূজার পদ্ধতির মধ্যে যমপুরাণ, ধান্যের চাষ প্রভৃতি কয়েকটা কথা কিছুতেই আনিতে পারা যায় না। মোট কথা, প্রত্যেক পুথীতেই ঠাকুরের স্নান-পূজা, হরিচন্দ্র রাজা ও রাণী কিম্বা অপর যাত্রীর পূজা দেওয়া, কোথাও মহুই (ঠাকুরের ভোগ,) ইত্যাদি আছে। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, তাহা সকল পুথীতে ঠিক এক নহে। কবিতা, কবিতার পরিমাণও এক নয়। অতএব বোধ হয় কোন্ একখানা প্রাচীন পুথী ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন লেখক গান রচনা করিয়াছিলেন।

৭। শূন্যপুরাণের রচনাস্থান।

ভাষা বিচার করিবার সময় দেখা যাইবে শূন্যপুরাণে যেমন নানা-সময়ের রচনা আছে, তেমনই একাধিক স্থানের রচনাও আছে। কারকের বিভক্তিতে ও ক্রিয়াপদে শূন্যপুরাণের ভাষার সহিত ওড়িয়া ভাষার সাদৃশ্য আছে, উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিতও আছে। তথাপি অধিকাংশ রাঢ়ে মধ্যরাঢ়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন, মধ্যরাঢ়ের দ্বারকেশ্বর নদীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শূন্যপুরাণের শব্দের মিল আছে। এই হেতু স্থূলতঃ রাঢ়ের ভাষা বলিতেছি।

চ-পুথীতে নিরঞ্জনের রুষ্মা নামক কবিতায় মালদহের নাম করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তদিগের প্রতি যবনের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। সে অংশটা মালদহের লোকের রচনা হওয়া সম্ভব। ঐ পুথিতে ১৩৩ পৃষ্ঠায়—

'তালের কাণ্ডারি গুআর বাখারি
চিত্র কৈল নানা ভাতি।'

গ পুথীতে অনুরূপ শ্লোক, (৫৮ পৃষ্ঠে)

'তালর কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি
ছিটনি তপির উপর।'

'আদি ভূপতি' (হরিচন্দ্র রাজা) ধর্ম্মের ঘর নির্ম্মাণ করাইবেন। চিত্রগড়ের কামিনা—কর্ম্মকার-বিসাস্তর আসিয়া ঘর নির্ম্মাণ করিল। এই ঘরের কাঁথ পাথরের, থাম ফটিকের, মেঝা কাঞ্চনের হইল, কিন্তু গ-পুথীতে ময়ূরপুচ্ছের, খ-পুথীতে সোনার খড়ের ছাউনি হইল *। তা হউক, 'রাঅতি পাথর', 'হাতী মাড়মর পাথর,' 'রেঅটী পাথর', কিম্বা অন্য কোনও পাথর মধ্য রাঢ়ে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্ত উত্তর রাঢ়ে কিম্বা উত্তরবঙ্গে যাইতে হইবে। মধ্যরাঢ়ে তালের কাঁড়ী সুলভ, কিন্তু গুয়া আছে দুর্ল্লভ। গুয়া গাছের বাখারী কোথায় হয়? এনিমিত্ত যশোর বরিশাল ফরিদপুর শিলেট রঙ্গপুর প্রভৃতি দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে যাইতে হইবে।

* পাকা-ছাত হইল না কেন? গ-পুথীতে ঘর নির্ম্মাণ পরে পরে দুইবার করা হইয়াছে।

এমনও হইতে পারে, রাঢ়ের কবি ঐ স্থানে গিয়া গুয়ার বাথারী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শব্দে এই অনুমানে বাধা দিতেছে। খ পুথীতে (৪৭ পৃঃ) 'সুনাব খেড় মন্দির হইল।' নগেন্দ্রবাবু খেড় অর্থে খড় বুঝিয়াছেন। ইহাই ঠিক বোধ হয়। রাঢ়ে খেড় শব্দ নাই, পূর্ব্বকালেও ছিল না বলিতে পারা যায়, সকলেই বলে খড়। শূন্যপুরাণের অন্যত্র (৫৩ পৃঃ) 'অম দাঁতে করএ খড়।' এই খেড় শব্দের নিমিত্ত রাঢ় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। ধর্ম্মের ঘর পুখুর আড়ার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাঢ়ে পুকুরের অভাব নাই, বরং বাহুল্য আছে, এবং জলের সুবিধার নিমিত্ত পুকুর পাড়ে ধর্ম্ম ঠাকুরের মণ্ডপও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, পুকুরের জন্যে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে হইতেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম-ঠাকুর অদ্যাপি অজ্ঞাত আছেন। মোটের উপর, উত্তর রাঢ় এবং উত্তরবঙ্গে গেলে উপরের সকল বাধা মিটিয়া যায়।

শূন্যপুরাণে কোন কোন শব্দের স্বরের বিপ্রকর্ষ দেখা যায়। রাঢ়ে আদি শব্দ আইদ, আজি আইজ, বাতি রাইত উচ্চারিত হয়। কিন্তু মূল শব্দে স্বরবর্ণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষ-প্রায় হয় না, শব্দের মধ্যে স্বর আগমও হয় না।* শূন্যপুরাণে পাই, ভাইসিতে (ভাসিতে), আইট (আট, অষ্ট), কাইঠ (কাঠ), জয়না (জনা), ইত্যাদি। হয়ত পূর্ব্বকালে রাঢ়ের গ্রাম্য লোক শব্দগুলি ঐরূপ উচ্চারণ করিত, হয়ত কোন কোন অংশ উত্তরবঙ্গ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ধর্ম্মপূজা অজ্ঞাত বটে, উত্তরবঙ্গে নহে।

৮। শূন্যপুরাণের মূল্য।

ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে আমি কখন আলোচনা করি নাই। শূন্যপুরাণের মূল্য সম্বন্ধে নীচের কথাগুলি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত লিখিতেছি।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে (সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৪ সাল) লাউসেন রঞ্জাবতী ইত্যাদি নাই, আছে শূন্যপুরাণের অংশবিশেষ। যথা,—

"উর উর ধর্ম্মরাজ সিদ্ধকর মোর কাজ
দানপতি আছে মুখ চেয়ে।
হরিচন্দ্র মহারাজা আনন্দে করিল পূজা
নিজপুত্র দিয়া বলিদান।
মদনা তাহার রাণী চোখে না পড়িল পানী
আত্মপূজা দিল সাবধান॥"

ইত্যাদি। এই ধর্ম্মমঙ্গলে পাই, আদি রাজা হরিচন্দ্র প্রথমে ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন। ধর্ম্মনিন্দা করাতে তিনি অপুত্রক হইয়াছিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া, এমন কি, বনে প্রাণ হারাইয়া এবং পরে ধর্ম্মের কৃপায় প্রাণলাভ এবং লুইচন্দ্র নামক পুত্রলাভ করেন।

---

* মরত্তা, করলা, পিরর প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের মাঝে স্বর আগম হইয়াছে। কিন্তু এরূপ শব্দ অল্প।

শূন্যপুরাণেও হরিচন্দ্র রাজার ধর্ম্মপূজা এবং তাঁহার মদনা রাণীর কথা পাই। পুত্র-লাভেচ্ছায় হরিচন্দ্র ধর্ম্মের নূতন মণ্ডপ করাইয়া সমারোহের সহিত পূজা দিয়াছিলেন।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৫ সালের ২য় সংখ্যা) ময়নামতীর গান পড়িয়া মনে হয়, এই ময়নামতী এবং শূন্যপুরাণের ও সহদেব চক্রবর্ত্তীর মদনা রাণী এক। মদনা হইতে ময়না শব্দ আসিয়াছে, (তুলনা কর, ময়না পাখী, ময়না কাঁটার গাছ)। মদনাবতী, মদনা যুবতী নামে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ময়নামতীও অপুত্রক ছিলেন, এবং রাজা মাণিকচাঁদের দেহত্যাগের পর এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। হরিচন্দ্র রাজার দুই কন্যার সহিত গোপীচন্দ্রের বিবাহ হয়। অতএব ময়নামতীর গানে হরিচন্দ্র ময়নামতীর বেহাই, শূন্যপুরাণে মদনার স্বামী।

ময়নামতীর গান নামক প্রবন্ধকার রঙ্গপুরের বৃদ্ধ জুগী বা যোগীদের মুখে শুনিয়া গানের বিষয় এবং অনেক পদ লিখিয়াছেন।* এই গানের নায়ক নায়িকা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতি ছিলেন। লেখক মহাশয় রঙ্গপুরে তাঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন পাইয়াছেন।

আমার বোধ হয়, ময়নামতীর গানের উপাখ্যান রূপান্তরিত হইয়া রাঢ়ের শূন্যপুরাণে এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে দেখা দিয়াছে। এই অনুমান ঠিক হইলে মাণিকচাঁদ গোপীচাঁদ প্রভৃতির রাজত্বের বহুপরে শূন্যপুরাণ লিখিত হইয়াছিল।

আরও বোধ হয়, বঙ্গদেশের দুই প্রাচীন রাজা ধর্ম্মসেবক হইয়া ধর্ম্মপূজা প্রচার করিয়া-ছিলেন। উত্তরবঙ্গের মাণিকচন্দ্র কিম্বা হরিচন্দ্র ধর্ম্মপূজার আদ্য ভূপতি, এবং দক্ষিণ রাঢ়ের কর্ণসেন লাউসেন পরবর্ত্তী অন্য রাজা। এই দুই রাজাকে নায়ক করিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তি। ময়নামতীর গানে, শূন্যপুরাণে, সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে প্রথম রাজাকে, এবং মাণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দ্বিতীয় রাজাকে পাই। এই দুই ভাগে সমুদয় ধর্ম্মমঙ্গল ভাগ করিতে পারা যায় কি না, তাহা ধর্ম্মমঙ্গলপাঠকের বিবেচ্য রহিল। আশ্চর্য্যের কথা, লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড় নামে, উত্তর বঙ্গের ময়না এবং হরিচন্দ্র কিম্বা মাণিকচন্দ্রের মদনা বা ময়না নাম পাইতেছি।

ময়নামতীর গান-সংগ্রাহক রঙ্গপুরের যোগীর নিকট গান শুনিয়াছেন। আমার বোধ হয়, দক্ষিণ রাঢ়ে যোগী জাতির নিকট অনুসন্ধান করিলে গোবিন্দচন্দ্রের গীত, এমন কি সমস্ত পালার পুথী মিলিবে। এই যোগী জাতি গোরক্ষনাথের শিষ্য। ইহাদের নিকট গোরক্ষনাথ মহাদেবের নাম। ওড়িশ্যাতেও গোরক্ষনাথের শিষ্য যোগী জাতি আছে, এবং ইহারাও

---

* লেখক মহাশয় এই পদগুলিতে প্রাচীন বানান দিয়াছেন। প্রাচীন বানান হেতু পদগুলি প্রাচীন বলিয়া ভ্রম হয়। খোলা কথায় শব্দের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত সকল স্থলে সেকালের বানান আবশ্যক হয় না। যাহা হউক, এই গান যে মুসলমান রাজত্বের বহু পরে রচিত, তাহা মুলুক, দেওয়ান, চাকরি, খাজনা, দরবার, মোকাম, বরাবর, দরিয়া, গোলাম, বাজার, কোমর, রাইত, দোকান, কসী, মহল ইত্যাদি শব্দের ভূরিপ্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

গোরক্ষনাথ ও মহাদেব অভিন্ন ভাবিয়া থাকে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ইহাদের জীবিকা। ভিক্ষা করিবার সময় ইহারা নানা গীতের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের গীতও গায়। ইহাদের ঘরে তালপাতার পুথীতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্পূর্ণ গীত লিখিত আছে। ভিক্ষা করিবার সময় যোগীরা ঐ গীতের কিয়দংশ গায়। এমন প্রাঞ্জল ভাষায় করুণরসপূর্ণ স্বাভাবিক কবিত্ব অল্পই পাওয়া যায়।* পাঠকের কৌতূহল মিটাইবার অভিপ্রায়ে ঐ গীতের বিষয় পরে লেখা যাইবে। দেখা যাইবে, বঙ্গদেশে মাণিকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর নাম মুক্তাদেবী। ইনি প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পরে গোবিন্দচন্দ্র নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রের আয়ু আঠার বৎসর মাত্র জানিয়া রাণী গোবিন্দচন্দ্রকে হাড়ীপা নামক এক হাড়ীর নিকট দীক্ষিত করান। গোবিন্দ চন্দ্র যোগী হইয়া পরে অমর হন। তিনি আর গৃহবাসী হন নাই। যোগী হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অনেক (১৮ গণ্ডা) বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রোদনা ও পোদনা, কেহ বলে রোদমা ও পোদমা, দুই রাণী প্রধানা ছিলেন। এই গীতে মুক্তাদেবীর মাতার নাম মউনা দেবী। রোদনা ও পোদনা কাহার কন্যা, তাহা ভাল বোঝা যায় না। কোন গীতে তাঁহারা হরিচন্দ্র রাজার কন্যা ছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে গানে ও উপাখ্যানে মাণিকচন্দ্র ও হরি-চন্দ্রের মহিষীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

দক্ষিণ রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন, শীতলার গাজন ইত্যাদি গ্রামের দেবদেবীর গাজন হইয়া থাকে। শিবের গাজন চৈত্রমাসের শেষ দিন অর্থাৎ নববৎসরারম্ভে হইয়া থাকে। গ্রামের সাধারণের যে শিব তাঁহার গাজন হয়, গৃহস্থের প্রতিষ্ঠিত শিবের হয় না। এই গাজনে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির লোকে দিন কএকের তরে সন্ন্যাসী হয়, গলায় উত্তরীয় (যজ্ঞোপবীত) পরে এবং শুদ্ধাচারে থাকে। এই গাজনের একটা বিশেষ অঙ্গ গম্ভারীবৃক্ষচ্ছেদন,—চলিত কথায় গামারকাটা। গাজনের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীরা বাদ্যভাণ্ড লইয়া গামার গাছ, প্রায়ই গাছের একটা ডাল, কাটে। গাজনের দিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসীরা জিহ্বাপৃষ্ঠ ফুড়িত, অগ্নিকুণ্ডের উপরে, লোহার শলাময় কাঠের পাটার উপরে উচ্চ মাচা হইতে লাফাইয়া পড়িত, উচা কাঠের মাথায় চড়ক গাছে শূন্যে ঘুরিতে থাকিত, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ চণ্ডী,—'চৈত্রমাসে শিব পূজে নানা উপহারে। ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥ জিহ্বা ফোড়ে জিহ্বা কাটে কবয়ে চড়ক।' ইত্যাদিতে রঞ্জাবতী ও লাউসেনের দারুণ তপস্যা মনে পড়ে। মনে হয়, শিবের গাজন ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের রূপান্তর, এবং শিব ও ধর্ম্মঠাকুর অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শিবের গাজনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ একত্র করিলে উহার মূলে ধর্ম্মের পূজা পাওয়া যাইতে পারে।

---

* গোবিন্দচন্দ্র রাজার দীক্ষা অংশটুকু ওড়িয়াতে ছাপা হইয়াছে, কিন্তু সেটুকু গোবিন্দচন্দ্রের গীতের অসার অংশ।

গাজন শব্দ সং গর্জ্জন হইতে উৎপন্ন বোধ হয়। পাপী বিশেষতঃ ধর্ম্মবিদ্বেষীকে ঠাকুরের গর্জ্জন—তর্জ্জন বা ভর্ৎসন। লোকে সন্ন্যাসী হইয়া দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ ভিক্ষা করে। ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপান হয়। সে ফুল খসিয়া পড়িলে সন্ন্যাসীরা বুঝিতে পারে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। না পড়িলে আরাধনা ও কাতরোক্তির অন্ত থাকে না। আশ্চর্য্যের কথা, পূর্ব্ববঙ্গে গাজন শব্দ নাই, ওড়িশায়ও গাজন শব্দ নাই, কিন্তু শবর বাউরী তাঁতী ধোবা অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গাজনের অনুরূপ ব্যাপার আছে। চৈত্রসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ঐ সকল জাতির 'ঝামযাত' হয়। ঝাম সং ধামন্—তেজ, কিম্বা ধ্মাত—দগ্ধ শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে। ঝামযাত—ঝাম-যাত্রা অর্থাৎ অগ্নিযাত্রা বলা যাইতে পারে। এই যাত্রায় অগ্নির উপরে ভক্তেরা দোল খায়, অগ্নির প্রণালীব উপর চলিয়া যায়। লৌহময় পট্টে ঝম্প দেয়—এই হেতু ভক্তের নাম 'পাটুআ'। উচা বাঁশে শূন্যে ভ্রমণ করে। এই বাঁশের নাম চরখি (সং চক্র হইতে)। বস্তুতঃ পশ্চিম-বঙ্গে গাজনে যেমন কৃচ্ছ্র-ব্যাপার আছে বা ছিল, ওড়িশাতেও তেমন আছে বা ছিল। 'পাটুআ' কোথাও মহাদেবের, প্রায়ই চণ্ডিকার ভক্ত। অতএব উত্তরবঙ্গ হইতে ওড়িশার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ধর্ম্মের গাজন প্রচলিত আছে। ওড়িশায় ধর্ম্মঠাকুর আছেন বলিয়া অনেকে জানেন না। কিন্তু বাউরী জাতি যে প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মঠাকুরের উপাসক তাহা নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন এবং লেখকেরও বিশ্বাস হইয়াছে। বাউবী ভিন্ন অন্য এক জাতি বাঁকি নামক স্থানে অদ্যাপি বৌদ্ধ আছে। তাহাদের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থও আছে।*

সং উপাধ্যায় শব্দ হইতে ওঝা উপাধি। কিন্তু ভূতেব রোজাও উপাধ্যায় ছিলেন বোধ হয় না। বৌদ্ধ শব্দও স্বচ্ছন্দে পঝা—ওজা—রোজা হইতে পারে। রোজার অনেক মন্ত্রে 'হাড়ীঝী চণ্ডীর আজ্ঞা' আছে। ময়নামতীর গানে পাই, 'হাড়িসিদ্ধা' নামে তন্ত্রসিদ্ধ এক হাড়ী বঙ্গদেশে ছিল। সে হাড়ীর কোন ডাকিনী ঝী ছিল। তিনি ডাইনী ময়নামতী নহেন ত? ময়নামতীর প্রতি চণ্ডীর কৃপা ছিল এবং ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের কুলদেবী চণ্ডী ছিলেন। এ কথা ময়নামতীর গানে পাইতেছি। লাউসেনের এক স্ত্রীও চণ্ডীর ভক্ত ছিলেন।

৯। শূন্যপুরাণের ভাষা।

শূন্যপুরাণে নানা সময়ের এবং বোধ হয় নানা স্থানের লোকের ভাষা মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি শূন্যপুরাণখানি পড়িলে বাঙ্গালাভাষার ক্রমবিবর্ত্তনের একটা স্থূল আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন শব্দ বুঝা যাইতেছে না। হয়ত পুথিতে লেখা অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ ছিল।

---

* গত 'সেন্‌সসে'র সময় আমার এক বন্ধু এই জাতির বৌদ্ধধর্ম্ম আবিষ্কার করেন। সে সময়ে জাতির নাম ধাম ও গ্রন্থের নাম টুকিয়া রাখি নাই। বোধ হইতেছে, সে জাতি তাঁতী।